হৃদয়োচ্ছ্বাস

বা

ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ

এম্, এ-প্রণীত।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়-সঙ্কলিত।

কলিকাতা

ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক-ভবনস্থ
সরস্বতী যন্ত্রে
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৮১ সাল।

PUBLISHED BY B. BANERJEE & CO.,
25, 26 & 27 CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.
1881.

বিজ্ঞপ্তি।

কতিপয় বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে "আর্য্যদর্শনে" প্রকাশিত সম্পাদকের রচনাবলির মধ্যে, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান-সংক্রান্ত কতিপয় প্রবন্ধ একত্র সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। শুদ্ধ বন্ধুগণের প্ররোচনা-প্রেরিত উত্তেজনায় এই গ্রন্থের উৎপত্তি হয় নাই। সাময়িক পত্রিকা-লিখিত সন্দর্ভের অতি অল্পসংখ্যকই সাধারণের বিষয়গোচর থাকে। অনুসন্ধিৎসাশালী পঠনশীল ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের নিকটে তাহাদের অস্তিত্ব অবাস্তব। কিন্তু অর্দ্ধশিক্ষিত চৌর্য্যপ্রিয় দলের তাহা প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠে। উপরে যাহা বলা হইল, তাহার মধ্যে কল্পনার বর্ণে অনুরঞ্জিত বর্ণমাত্রও নাই। হীনাবস্থ বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের এক দলের চৌর্য্যই আজ কাল প্রধান অবলম্বন—একমাত্র ব্যবসায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থলেই নির্দ্দেশিত হইতে পারে, "স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ" "আধুনিক ভারত" ও "ভারতের ভাবী পরিণাম" এই কয়েকটী অবলম্বন করিয়া কিছু দিন হইল, এক বক্তৃতা-পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। অধিক কি, হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রণেতার অন্যতম গ্রন্থ মিলের "অবতারণিকার" প্রথমাংশের সুবাক্ত ছায়ায় এক খান জীবনীর সূচনা পর্য্যন্তও হইয়াছে! এইরূপেই মূলীভূতের অসম্মাননা ও নকলের আধিপত্য হয়। তাই বলিতেছিলাম, "হৃদয়োচ্ছ্বাসের" জন্মের কারণ একাধিক।

এই পুস্তকনিবদ্ধ সন্দর্ভসকলে যথেষ্ট উদ্দীপনার প্রসর ও ভাবতরঙ্গের খেলা আছে, এজন্য গ্রন্থের আখ্যা "হৃদয়োচ্ছ্বাস" দেওয়া গিয়াছে। ইহাতে ক্রমান্বয়ে দশটী বিষয়ের বিবরণাত্মক প্রবন্ধ সমাবেশিত আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব আদৌ 'হিন্দুমেলা'ও 'বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভায়' পঠিত হইবার জন্য বিরচিত হয়। এই সকল

রচনার ভাষা বা ভাব-সম্বন্ধে সাধারণকে আমাদের আত্ম-অভিমতি প্রদান করা অপেক্ষা, বহুজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতের সারাংশ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। গুণগ্রাহী পাঠক তাহা দেখিয়া রচয়িতার গভীর প্রত্নতত্ত্বালোচনা, কাব্যোপম সুন্দর বর্ণনাচ্ছটা ও সহৃদয় ভাবোচ্ছ্বাসাদির বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। বহু আড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন। এই স্থলে আমরা কেবল 'অতীত ও বর্ত্তমান ভারত'-সম্বন্ধে বিজ্ঞগণের মতামত প্রকটন করিলাম :—

“অতীত ও বর্ত্তমান ভারত” কলিকাতাস্থ “বঙ্গভাষাসমালোচনী সভার” ৬ষ্ঠ বার্ষিক ১ম ও ২য় অধিবেশনে* আলবার্ট হলে প্রদত্ত হয়। উভয় দিবসেই মহামান্য রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসনে আসীন ছিলেন। সভাস্থলে সমবেত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিদ্যার্থিবৃন্দ ও সমাচারপত্রিকাসম্পাদক প্রভৃতির উপস্থিতিতে সভায় নয়ন-মনোরম এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। সে যাহা হউক, সভাপতি মহাশয় সেই সুদীর্ঘ ও প্রীতিপ্রদ, মহান্ ভাবব্যঞ্জক অথচ গবেষণাসঙ্কুল বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহার মতে বক্তৃতার ভাষা 'অমৃতময়'**।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাদিগকে কোন পত্রে লিখিতেছেন† :—“যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পুলকিত হইলাম। যদ্যপি কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতের ঐক্য নাই, তথাপি লেখাটী অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। তিনি আমাদের বক্তাদিগকে যে, বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন ‡, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম।”

---

* ১২৮৭ সাল, ২৭ শে বৈশাখ ও ২রা জ্যৈষ্ঠ।

** 'বঙ্গভাষাসমালোচনী সভার' কার্য্যবিবরণ।

† ১২৮৭ সাল, ২৩ শে শ্রাবণের পত্র।

‡ “অতীত ও বর্ত্তমান ভারতের” বক্তার (যোগেন্দ্রবাবুর) নিম্নোক্ত লেখা পাঠ করিয়া রাজনারায়ণ বাবু ঐ কথা বলিয়াছেন :—

সাধারণী সম্পাদকও ইহাকে "চিন্তাপ্রসূত" †† বলিয়াছেন ইত্যাদি। আর অধিক মন্তব্য-উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। সম্পাদকের অন্যান্য রচনা-সম্বন্ধে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। সুধী পাঠকগণের উপর তাহার ভার অর্পণ করিতেছি। তাঁহারা পাঠ করিয়া দেখুন যে, উক্ত বর্ণনার মধ্যে কবিত্ব ও গবেষণা, নীতিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন, ভাষার পারিপাট্য ও ঔদার্য্যগুণের সত্তা বর্ত্তমান কি না। ফলে রচনাবলি যে, মৌলিকতা-বিবর্জ্জিত নহে, নির্দ্দেশ অত্যুক্তিমাত্র।

সম্প্রতি পুস্তক-সংক্রান্ত আর একটী অবশ্যবক্তব্য বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। প্রবন্ধ-মধ্যে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক-ভাগ আছে, তাহা বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে এবং টীকার শ্লোকভাগ নাগরাক্ষরে মুদ্রিত করা গিয়াছে।

এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন-কালে সরস্বতী-যন্ত্রাধিকারী আমাদের বন্ধু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রুফ্-সংশোধনাদি-বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য এই অবসরে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভারত-বিষয়ক এই সকল চিত্র যদি, ভারতীয়গণের অন্তর মুকুরে প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলেই এই পুস্তক-মুদ্রণের উদ্দেশ্য সফল।

১৪ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট্। }
১২ ই মাঘ, ১২৮৭ সাল। }

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়,
সঙ্কলয়িতা।

"এই প্রস্তাবটী বঙ্গভাষাসমালোচনী সভায় পঠিত হয়। বঙ্গভাষা-সমলোচনী সভার অধ্যক্ষগণ বঙ্গভাষার চর্চ্চার জন্য যেরূপ যত্ন ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে দিন দেখিব যে, অন্যান্য সভার অধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগের উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া, বঙ্গভাষায় বক্তৃতাদি আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিন বুঝিব যে, আমাদিগের প্রকৃত জাতীয় জীবন আরম্ভ হইয়াছে।" [আর্য্যদর্শন ; ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা (১২৮৭, বৈশাখ)।]

†† সাধারণী, ১৪ ভাগ, ১৬ সংখ্যা [১৮ই শ্রাবণ, ১২৮৭ সাল]

রচনার ভাষা বা ভাব-সম্বন্ধে সাধারণকে আমাদের আত্ম-অভিমতি প্রদান করা অপেক্ষা, বহুজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতের সারাংশ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। গুণগ্রাহী পাঠক তাহা দেখিয়া রচয়িতার গভীর প্রত্নতত্ত্বালোচনা, কাব্যোপম সুন্দর বর্ণনাচ্ছটা ও সহৃদয় ভাবোচ্ছ্বাসাদির বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। বহু আড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন। এই স্থলে আমরা কেবল 'অতীত ও বর্ত্তমান ভারত' সম্বন্ধে বিজ্ঞগণের মতামত প্রকটন করিলাম :—

"অতীত ও বর্ত্তমান ভারত" কলিকাতাস্থ "বঙ্গভাষাসমালোচনী সভার" ৬ষ্ঠ বার্ষিক ১ম ও ২য় অধিবেশনে* আলবার্ট হলে প্রদত্ত হয়। উভয় দিবসেই মহামান্য রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসনে আসীন ছিলেন। সভাস্থলে সমবেত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিদ্যার্থিবৃন্দ ও সমাচারপত্রিকাসম্পাদক প্রভৃতির উপস্থিতিতে সভায় নয়ন-মনোরম এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। সে যাহা হউক, সভাপতি মহাশয় সেই সুদীর্ঘ ও প্রীতিপ্রদ, মহান্ ভাবব্যঞ্জক অথচ গবেষণাসঙ্কুল বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহার মতে বক্তৃতার ভাষা 'অমৃতময়'**।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাদিগকে কোন পত্রে লিখিতেছেন† :—"যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পুলকিত হইলাম। যদ্যপি কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতের ঐক্য নাই, তথাপি লেখাটী অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। তিনি আমাদের বক্তাদিগকে যে, বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন ‡, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম।"

---

* ১২৮৭ সাল, ২৭ শে বৈশাখ ও ২রা জ্যৈষ্ঠ।

** 'বঙ্গভাষাসমালোচনী সভার' কার্য্যবিবরণ।

† ১২৮৭ সাল, ২৩ শে শ্রাবণের পত্র।

‡ "অতীত ও বর্ত্তমান ভারতের" বক্তার (যোগেন্দ্রবাবুর) নিম্নোক্ত লেখা পাঠ করিয়া রাজনারায়ণ বাবু ঐ কথা বলিয়াছেন :—

সাধারণী সম্পাদকও ইহাকে "চিন্তাপ্রসূত" †† বলিয়াছেন ইত্যাদি। আর অধিক মন্তব্য-উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। সম্পাদকের অন্যান্য রচনা-সম্বন্ধে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না সুধী পাঠকগণের উপর তাহার ভার অর্পণ করিতেছি। তাঁহারা পাঠ করিয়া দেখুন যে, উক্ত বর্ণনার মধ্যে কবিত্ব ও গবেষণা, নীতিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন, ভাষার পারিপাট্য ও ঔদার্য্যগুণের সত্তা বর্ত্তমান কি না। ফলে রচনাবলি যে, মৌলিকতা-বিবর্জ্জিত নহে, নির্দ্দেশ অত্যুক্তিমাত্র।

সম্প্রতি পুস্তক-সংক্রান্ত আর একটী অবশ্যবক্তব্য বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। প্রবন্ধ-মধ্যে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক-ভাগ আছে, তাহা বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে এবং টীকার শ্লোকভাগ নাগরাক্ষরে মুদ্রিত করা গিয়াছে।

এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন-কালে সরস্বতী-যন্ত্রাধিকারী আমাদের বন্ধু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রুফ্‌-সংশোধনাদি-বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য এই অবসরে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভারত-বিষয়ক এই সকল চিত্র যদি, ভারতীয়গণের অন্তর মুকুরে প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলেই এই পুস্তক-মুদ্রণের উদ্দেশ্য সফল।

২৫ নং মজাপুর ষ্ট্রীট্। }
১২ ই মাঘ, ১২৮৭ সাল। }

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়,
সঙ্কলয়িতা।

"এই প্রস্তাবটী বঙ্গভাষাসমালোচনী সভায় পঠিত হয়। বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভার অধ্যক্ষগণ বঙ্গভাষার চর্চ্চার জন্য যেরূপ যত্ন ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে দিন দেখিব যে, অন্যান্য সভার অধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগের উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া, বঙ্গভাষায় বক্তৃতাদি আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিন বুঝিব যে, আমাদিগের প্রকৃত জাতীয় জীবন আরম্ভ হইয়াছে।" [আর্য্যদর্শন ; ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা (১২৮৭, বৈশাখ)।]

†† সাধারণী, ১৪ ভাগ, ১৬ সংখ্যা [১৮ই শ্রাবণ, ১২৮৭ সাল]

স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ।

অদ্য উনবিংশ শতাব্দী। চতুর্দ্দিকে সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের স্রোত তর্ তর্ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ধর্ম্মের মূল পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সামাজিক নীতির আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, রাজনীতি নূতন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইতেছে, জীবনের লক্ষ্য নূতন আকার ধারণ করিতেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন আবার নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। এই বিশ্বব্যাপী প্রলয়কালে—যখন সকল বস্তুই আমূল আলোড়িত হইতেছে, যখন সুসভ্য দেশমাত্রই নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিতেছে—জগতের আদি সংস্কারক, সভ্যতা-মার্গের প্রথম অধিনায়ক, মানবকুলের শৈশবদোলা, ভারত কেন ঘুমাইয়া রয়?

যে তারে এক দিন আর্য্য-হৃদয় পরস্পর গ্রথিত ছিল, যে তারে এক দিন ভারতবাসীমাত্রেরই হৃদয় অনুস্যূত ছিল, সে তার আজ্ কেন ছিন্ন? যে তারের বৈদ্যুতিক বলে এক দিন কতিপয়মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অমানুষী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, যে তারের বৈদ্যুতিক সংযোগে একটী আর্য্যহৃদয়ে আঘাত লাগিলে এক দিন সমস্ত আর্য্য-হৃদয় আহত হইত, আজ্ কেন সেই তার বিযুক্ত? ভারতকে জগতের আদর্শ বলিয়া পরিচয় দিয়া যে আর্য্যজাতি এক দিন স্বদেশানুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে আর্য্যজাতি আপনাদিগকে "আর্য্য" (পূজ্য, বা মানবকুলের শ্রেষ্ঠ) এই উপাধি প্রদান করিয়া এক দিন স্বজাতি-প্রেমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে আর্য্যজাতি আজ্ কোথায়? স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের সে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আজ্ কোথায়?

যৎকালে ঋক্‌বেদ-প্রণেতা ঋষিগণ কতিপয় বীর পুরুষ ও কতিপয়

বণিক্-সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে হিন্দুকুশ বাহিয়া সিন্ধু উত্তরণ পূর্ব্বক পঞ্চনদ প্রদেশে অবতরণ করেন, তখন তাঁহারা কয় জন ছিলেন? যখন কপালাভরণা কালী তাঁহাদিগের হইয়া অসুর-বিমর্দ্দে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা কয় জন ছিলেন? রাক্ষসদিগের উপদ্রবে যখন ঋষিদিগের পদে পদে তপোবিঘ্ন ঘটিত, তখন তাঁহারা কয় জন ছিলেন? অভ্রভেদী হিমশৃঙ্গ হইতে পাতাল-ভেদী দক্ষিণ পয়োধি পর্য্যন্ত এবং প্রবল স্রোতস্বিনী সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত এই বিশাল ভারত-ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তই তখন অসুর ও রাক্ষসাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল। এই বিশাল ভারত-ক্ষেত্রের এক সহস্রাংশমাত্রও তৎকালে আর্য্যগণ কর্তৃক অধিকৃত ও উপনিবেশিত হয় নাই। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের সংখ্যার সহিত তুলনায়, তদানীন্তন আর্য্য ঔপনিবেশিকদিগের সংখ্যা অনন্ত সাগরে জলবিন্দু-পতনের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইত! অসুর ও রাক্ষসাদি যে শুদ্ধ সংখ্যায় অনন্ত ছিল, এরূপ নহে; তাহাদিগের প্রবল পরাক্রমের অজস্র দৃষ্টান্ত প্রাচীন ঋক্‌বেদ হইতে আধুনিক কাব্য-পুরাণাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে কি বলে ও কি সাহসে সেই অসংখ্য ও প্রবল শত্রুদিগের বিরুদ্ধে কতিপয়মাত্র আর্য্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন? কি সাহসেই বা তাঁহারা শত্রু-সমাচ্ছন্ন ভারত-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিলেন? তাঁহাদের কি জীবনে কোন মায়া ছিল না? অসুর-রাক্ষসাদির প্রবল পরাক্রমের সংবাদ কি তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই? জীবনে মায়া না থাকিলে তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অসংখ্য গিরি-নদী উত্তরণপূর্ব্বক সুদূর প্রাচ্য প্রদেশে কখনই আগমন করিতেন না। অধিকতর সুখের আশা না থাকিলে তাঁহারা জন্মভূমির মায়া জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। আর বৃহস্পতি যে আর্য্যদিগের উপদেষ্টা, তাঁহাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, এবং চাণক্য যে আর্য্যদিগের মন্ত্রী, তাঁহারা যে ভারতের শূদ্রাসুর-রাক্ষসাদির প্রবল পরাক্রমের বিষয় অবগত ছিলেন না, একথাও বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। তবে তাঁহারা কি বলে ও কি সাহসে গিরি-নদী-সাগর-পরি-

বেষ্টিত অনন্ত ভারত-ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, এবং অবতরণ করিয়া কি বলে ও কি সাহসেই বা প্রবলপরাক্রান্ত আদিম অধিবাসীদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন? কি বলেই তাঁহারা অবশেষে রাক্ষস ও অসুর কুলধ্বংস করিয়া অসীম ভারতক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করিলেন? কি বলেই বা তাঁহারা শেষে অসংখ্য বিজিত আদিম অধিবাসীদিগকে বিনয়াবনত দাস করিতে সক্ষম হইলেন? এ মর্ম্মভেদী গভীর প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? স্বজাতিপ্রেমের বলের এরূপ উদাহরণ আর কোথায়?

যৎকালে অসংখ্য জেরাক্সিস্-সেনা প্রবল সাগরতরঙ্গের ন্যায় উত্তর গ্রীস্ প্লাবিত করিয়া থার্ম্মাপিলি-সমীপে উপনীত হয়, তখন কি সাহসে ও কি বলে বীরচূড়ামণি লিয়োনিডাস্ ত্রিশতমাত্র সহচর সমভিব্যাহারে সেই প্রবল সাগরতরঙ্গের প্রতিরোধে বক্ষ পাতিয়া দিয়াছিলেন? কি আভ্যন্তরীণ বলেই বা সালামিস্ যুদ্ধে কতিপয় গ্রীক্ যোদ্ধা জেরাক্সিসের অনন্ত সেনাসাগরের অপ্রতিহত গতি প্রতিরুদ্ধ করিলেন?

যৎকালে বীরবর হানিবাল্ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ইতালী বিলোড়ন পূর্ব্বক অবশেষে কাণি সমরে অধিকাংশ রোমীয় জননীকে পুত্র-বিরহ ও অধিকাংশ রোমীয় পত্নীকে পতিবিরহ বিধুর করিয়াছিলেন, তখন কোন্ দৈবী শক্তি বলে কতিপয় দিবসের মধ্যেই রোমরাজ্য অনন্ত সেনা সংগ্রহ করিলেন?

যৎকালে আফ্রিকবিজয়ী সিপিয়ো জামাসমরে অজেয় হানিবালকে পরাজিত করিয়া দুরন্ত সেনা-সমভিব্যাহারে হানিবলের প্রতি প্রতিহিংসা বিধানার্থ কার্থেজাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, তখন কি আভ্যন্তরীণ বলের প্ররোচনায় কার্থেজ্ রমণীগণ রজ্জু ও অস্ত্র প্রস্তুত করণার্থ আপনাদিগের কেশমুণ্ডন ও অলঙ্কারোন্মোচন করিয়াছিলেন?

যৎকালে দৃপ্ত বৃটিশ্-সিংহ সোদর-প্রতিম আমেরিকাবাসীদিগের ক্রন্দনে বধির হইয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের উপর কর-স্থাপনে বদ্ধ-পরিকর হন, তখন কি বলে অস্ত্রশস্ত্রে অসজ্জিত, শিক্ষা

বাণিজ্য-বিবর্জ্জিত আমেরিকা বৃটিশ্-সিংহের গতিরোধ করিতে সাহসিনী হন? যখন আমেরিকা বৃটিশ্-সিংহের কোপানলে পতিত হন, তখন আমেরিকাকেও সামান্য সূচিকা হইতে পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত গৃহসামগ্রীর জন্যই বৃটেনের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। ভারত অপেক্ষাও আমেরিকা তখন বৃটেনের অধিকতর মুখাপেক্ষী ছিলেন, ভারতে স্বদেশজাত অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়, কিন্তু তৎকালে আমেরিকাকে চিনিটী পর্য্যন্তের জন্য বৃটেনের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। এরূপ অবস্থায় কি বলে আমেরিকা দৃপ্ত বৃটিশ্-সিংহের কোপানল উদ্দীপিত করিতে সাহসিনী হইলেন? কি আভ্যন্তরীণ তেজ তাঁহাদিগকে বহির্জ্জাত দ্রব্যমাত্রেরই ব্যবহার হইতে একেবারেই নিরস্ত করিল? কোন্ বলেই বা তাঁহারা অচিরকালমধ্যেই আপনাদিগের সমস্ত অভাব বিদূরিত করিতে পারিলেন? কোন বলেই বা নিরস্ত্র বাণিজ্য মার্কিন ভূমি অচিরকালমধ্যে অনন্ত-বীর প্রসবিনী হইয়া উঠিলেন? কোন বলেই বা এই অনতিপ্রৌঢ় বীরাঙ্গনা বৃটিশ্-বীরকেশরীদিগকে রণে পরাস্ত করিলেন? যে আমেরিকা এক দিন বৃটেনের পদতলে নিষ্পিষ্ট, যে আমেরিকা এক দিন কিশোর-বয়স্কা বালিকার ন্যায় সকল বিষয়ে বৃটেনের মুখাপেক্ষিণী ছিল, যে আমেরিকা এক দিন অনন্ত জাতি-সাগরের একটা নগণ্য জলবুদ্বুদমাত্র ছিল, আজ কোন বলে সেই আমেরিকা— জগতের সভ্যজাতিগণের অগ্রগামিনী? কেন আজ সেই স্বগর্ভচ্যুতা দুহিতার বীরদর্পে বৃদ্ধা বৃটন জননী কম্পিত-কলেবরা?

অজেয় জর্ম্মান্‌সেনা রাজরাজেশ্বরী প্যারিনগরী অবরোধ করিল, দিন গেল, পক্ষ গেল, মাস গেল, অর্দ্ধ বৎসর অতীত হইল, ক্রমে ধনাগার শূন্য, অস্ত্রাগার শূন্য, খাদ্যাগার শূন্য, ক্রমে শৃগাল, কুক্কুর, অশ্ব, মূষিক, ভেক প্রভৃতি মনুষ্যের অখাদ্যও উপাদেয় খাদ্য-মধ্যে পরিগণিত হইল, তথাপি কোন্ অভ্যন্তরীণ বলে বলীয়ান হইয়া বীরকেশরী ফরাসিগণ অদমিত বীরদর্পে শত্রুসেনার ভীষণ গর্জ্জন উপেক্ষা করিলেন? কোন্ বলেই বা তাহারা তাদৃশ বিপৎপাতের পরও অচিরকালমধ্যেই পরাজয়ের নিষ্ক্রয়স্বরূপ অগণিত মুদ্রা উত্তো-

লিত করিলেন? কি বলেই বা সেই মৃতপ্রায় জাতি প্রতাপে আবার দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিল?

আবার যাও, এক বার ইতালীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যে ইতালী এক সময়ে তদাপরিজ্ঞাত জগতের অধীশ্বরী ছিলেন, যে ইতালী ইউরোপে দুই বার সভ্যতা ও স্বাধীনতা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই ইতালী প্রায় সহস্র বৎসর দাসত্বে জর্জ্জরিত-প্রায় হইয়াছিলেন, ইতালীর নাম লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, ইতালীর ইতিহাস—বৈদেশিক প্রবঞ্চকদের অসত্য বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইতালীর বীর পুরুষগণ নির্ব্বাসিত, জহ্লাদ-হস্তে হত, কারাগারে রুদ্ধ বা অন্যান্য নানা নিষ্ঠুর উপায়ে পর্য্যুদস্ত হইতেছিলেন, পুণ্যভূমি ইতালী ভীষণ শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তথাপি দৈবী-শক্তি-বলে সেই ভীষণ প্রেত-ভূমি হইতে সেই বীর পুরুষগণের রুধির-নিষেকে আবার দুই প্রকাণ্ড বীরতরু অভ্যুত্থিত হইল? কোন্ আভ্যন্তরীণ বলে ঋষিপ্রবর ম্যাট্সিনি ও বীর-চূড়ামণি গ্যারিবল্ডি সেই শ্মশান-ভূমিতে বহু দিনের পর আবার জীবনসঞ্চার করিলেন? কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়াই বা অসংখ্য ইতালীয় বীর পুরুষ স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতে জীবন আহুতি প্রদান করিলেন? আজ্ কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসরমাত্র ব্রিটিশ-কেশরী ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। এই অল্পকালমধ্যে কোন্ দৈবী-শক্তি-বলে ব্রিটিশ-কেশরীর গর্জ্জনে সমস্ত ভারত কম্পান্বিত? আজ্ কয় দিন হইল কয়জনমাত্র শ্বেত বণিক্ পশ্চিম সাগরের উপকূলে আসিয়া কেমন অদ্ভুত কৌশলে ধীরে ধীরে গগনস্পর্শী হিমশৃঙ্গ হইতে সিংহল ও আফ্গানস্থান হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য বিস্তার করিল। কেন এই কয়েকটীমাত্র শ্বেত পুরুষের সম্মুখে মোগল পাঠান—মহারাষ্ট্র শীক্—একে একে সকলেই বায়ুর নিকট তুষের ন্যায় উড়িয়া গেল? কেন আজ্ এই গুটিকত শ্বেত পুরুষের সম্মুখে বিংশতি কোটী ভারত-বাসী মৃৎপুত্তলীর ন্যায় নিস্পন্দ ও নীরব? কেন আজ্ কাশ্মীর, সিন্ধু, বরদা, হোল্কার, সিন্ধিয়া, নিজাম, নেপাল, ভুটান—সকলেই এই

শ্বেত চরণে লুণ্ঠিত-শির ? কেন আজ্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের নিকট গললগ্ন-কৃতবাস ? রাজ-রাজেশ্বর হইয়া কেন আজ্ আমরা পথের ভিখারী ? রত্ন-প্রসবিনী জননীর সন্তান হইয়া কেন আজ্ আমরা অন্নের কাঙ্গালী ? জগতের সভ্যতা-মার্গের নেতা হইয়া, কেন আজ্ আমরা লজ্জা-নিবারণের জন্য শ্বেত-দ্বীপের মুখাপেক্ষী ? জগতের শিক্ষক হইয়া, কেন আজ্ আমরা সকলের অশ্রদ্ধার ভাজন ? বীরত্ব-রত্নাকর ভারতের সন্তান হইয়া, কেন আজ্ আমরা সকলের চরণতলে ? যে সিংহাসন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিল, কেন আজ্ সেই সিংহাসন শূন্য ? যে বেদি এক দিন ঋক্ ও সামগায়ী ঋষিবৃন্দ দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছিল, কেন আজ্ সেই বেদি নীরব ? যে ক্ষত্রিয়জানু ও ক্ষত্রিয়-শির কেবল অভীষ্ট দেবতা ও বেদগায়ী ব্রাহ্মণগণের নিকটেই বিনত হইত, কেন আজ্ সেই ক্ষত্রিয়জানু ও ক্ষত্রিয়-শির সদা বিলুণ্ঠিত ? যে আর্য্য-পতাকা এক দিন জগতে হিন্দুজয়-ঘোষণা করিয়াছিল, কেন আজ্ সেই আর্য্য-জাতির সময় নিরন্তর মসীনদনে ও পাদুকাবহনে অতিবাহিত হইতেছে ? যে আর্য্য-জাতির সেনা এক দিন পারস্য, আফ্গান বিদলিত করিয়া, সুদূর স্কন্দনভ (স্কাণ্ডিনেভিয়া) পর্য্যন্তও উন্মথিত করিয়াছিল, দূরতম আমেরিকা-পর্য্যন্তও বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, কেন আজ্ জগদুন্মাথিনী সেই আর্য্যসেনা মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য ভোগীর ন্যায় নিষ্পন্দ ও নির্জীব ? যে আর্য্যজাতির রণতরি এক দিন পূর্ব্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে—জাবা, সুমাত্রা, সিংহল, সকৃট্রা, মিসর প্রভৃতি আলোড়িত করিয়াছিল, কেন আজ্ সেই আর্য্যজাতি সমুদ্র-যাত্রায় ভীত ? যে আর্য্যললনা এক দিন বক্ষঃস্থল হইতে স্তন্যপায়ী শিশুকে উন্মোচিত করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন, কেন আজ্ সেই আর্য্যললনা পুত্রকন্যাগণের সাহসিকতা ও বীরত্ব-প্রদর্শনের প্রতিকূল ? যে আর্য্য বীরনারী এক দিন স্বামী সঙ্গে-অসিহস্ত সমর-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বদেশহিত-ব্রতে সোণার অঙ্গ আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, কেন আজ্ সেই আর্য্যনারী স্বামীর স্বদেশানুরাগ প্রদর্শনের অন্তরায় ? যে আর্য্য বীরনারী এক দিন ধনুর্নিম্মাণার্থ অঙ্গের সুবর্ণা-

ভরণ খুলিয়া দিয়াছেন; আবার সেই ধনুকের ছিলা নির্ম্মাণার্থে একটী একটী করিয়া মস্তকের কেশও কাটিয়া দিয়াছেন, কেন আজ্ সেই আর্য্য নারী স্বদেশ-হিত ব্রতে আত্মত্যাগ-বিধুরা?

যে আর্য্যাবর্ত্ত এক দিন কুরুক্ষেত্র-রণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলেন, কেন আজ্ সেই বীরভূমি বীরশূন্য? যে আর্য্যতেজ এক দিন দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের অপ্রতিহত গতি রোধ করিয়াছিল, কেন আজ্ সেই আর্য্যতেজ প্রভাহীন? যে আর্য্য-প্রতাপের সম্মুখীন হইতে এক দিন বীরবর মহম্মদ ঘোরীও ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন, কেন আজ্ সে প্রতাপ তেজোহীন? সহস্র বৎসরের দাসত্বেও যে প্রতাপ নির্ব্বাপিত হয় নাই, কেন আজ্ সে প্রতাপ নিষ্ক্রিয়? রাজপুত-যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে, শীক-যুদ্ধে, যে বীর্য্য-বহ্নি বিস্ফুরিত হইয়াছিল, কেন আজ্ সে বীর্য্যবহ্নি নির্ব্বাণ-প্রায়? যে ভারত-সন্ততিগণ এক দিন বীর-দর্পে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন, কেন আজ্ সেই ভারত-সন্ততিগণ বীরত্বে মেষপ্রায়? কি শাপে আজ্ ভারত শ্মশান-প্রায়? কি পাপে আজ্ ভারতের জাতীয় জীবন বিলুপ্তপ্রায়?

এ হৃদয়-আলোড়ন-কারী গভীর প্রশ্ন সকলের কে মীমাংসা করিবে? কিসের অভাবে ভারতের এ দুর্গতি? কিসের জন্য পাশ্চাত্য দেশ সকলের এত উন্নতি? এই প্রশ্নের একই মীমাংসা—একই উত্তর। স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব ও সত্তা। স্বদেশ হিতব্রতে জীবনের পূর্ণ আহুতির ভাবাভাব। ইহার অভাবে ভারতের এ দুর্গতি—ইহার ভাবে পাশ্চাত্য দেশ সকলের এত উন্নতি। যাও আমেরিকায় যাও, যাও শ্বেতদ্বীপে যাও, বীরভূমি ফ্রান্সে যাও, যাও জগদীশ্বরী ইতালীতে যাও, যাও জার্ম্মণীতে যাও, যাও মৃতোত্থিত গ্রীসে যাও, যাও জগদ্বিজয়ী রুসে যাও, তাঁহাদিগের স্ব স্ব দেশের বিরুদ্ধে একটী কথা বল, দেখিবে, অচিরাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। দেখিবে, বাল হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত, অধিক কি, বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবে! জলে, স্থলে, জঙ্গলে,

পাহাড়ে—যিনি যেখানে আছেন, স্বদেশ ও স্বজাতি তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা, একমাত্র চিন্তার বিষয়। শয়নে স্বপ্নে, অশনে উপবেশনে, লেখনে কথনে,—স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান। তাঁহার প্রতি কার্য্যে ও প্রতি চিন্তায় স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত। সাহারার ভীষণ মরুভূমিতে, গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের তুহিনরাজিসমাচ্ছাদিত অনুর্ব্বর প্রদেশে, হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরে, অসভ্য-দস্যু-সমাচ্ছন্ন মধ্য আসিয়ায়—একটী ইউরোপীয় যে যেখানে আছে, স্বদেশের ও স্বজাতির পরিরক্ষণীয়। একটী ইউরোপীয়ের কেশ স্পর্শ কর, একটী ইউরোপীয়ের প্রাণ নাশ কর; দেখিবে, তাহার জাতি ও তাহার দেশ, তোমার জাতি ও তোমার দেশকে রসাতলে দিবে—দেখিবে, সেই ক্রোধানলে তোমার জাতি, তোমার দেশ, চির জীবনের জন্য স্বাধীনতা-হারা হইবে। এক অন্ধকূপ-হত্যার অপরাধে মুসলমানেরা চির কালের মত ভারত হারাইল! এক মার্গের সাহেবের মৃত্যুতে চীন ব্রহ্ম হুলস্থূল! এক সৈনিক-বধে আবিসিনিয়া সমাকুল! এক দূত-বধে আফগানিস্থান ওতপ্রত।

প্রত্যেক ইউরোপীয়ের হৃদয় স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমে বিচ্ছুরিত। তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ, কাম মোক্ষ সমস্তই—স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম। তাঁহার স্নেহ, তাঁহার ভক্তি—প্রবলতর হৃদয়ভাব, স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমের অন্তর্লীন। আমাদিগের রাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অব্ এডিন্‌বরা স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া পত্নীপ্রেম বিসর্জ্জন দিলেন। ফ্রান্স, ইতালী, আমেরিকা প্রভৃতিতে স্বদেশানুরাগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা আর অধিক দষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পাঠকগণকে আক্রান্ত করিতে চাহি না। যাহা প্রদত্ত হইল—যদি দৃষ্টান্তের উদ্দীপনা শক্তি থাকে—ইহাতেই স্বদেশবাসিগণের অন্তরে স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত হইতে পারিবে।

বহু দিনের দাসত্বে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম ভারতবাসীদিগের হৃদয় হইতে একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে। যে প্রবল স্বজাতি-প্রেমের

বলে এক দিন কতিপয়মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অনন্ত ভারত-ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন. আবার যে প্রবল স্বজাতি-প্রেমের বলে এক্ষণে কতিপয়মাত্র শ্বেত বণিক্ ভারতে অভূত-পূর্ব্ব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, সে স্বজাতি-প্রেম ও সে স্বদেশানুরাগ ভারতবাসীর হৃদয় হইতে এক্ষণে অন্তর্ধান করিয়াছে! ইংলণ্ডের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সেই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম ধীরে ধীরে দুই একটী মনীষীর হৃদয়-কোটরে প্রবেশ করিতেছে। ইংলণ্ডের উদ্দীপক সাহিত্য ও স্বাধীন ইতিহাস ধীরে ধীরে দুই চারি জনের অন্তরে সেই মূল মন্ত্র—স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম—উদ্দীপিত করিতেছে। ইংলণ্ড। তোমার নিকটে যদি আমরা কোন বিষয়ে ঋণী থাকি, তবে ইহারই জন্য। কিন্তু তোমার ভাষা, তোমার দৃষ্টান্ত ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর কয় জনের অধিগম্য? এক লক্ষ লোকের নিকটেও ইহা অধিগম্য কি না সন্দেহ। অবশিষ্ট উনবিংশ কোটি একোন-শত লক্ষ লোকের স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগ-শিক্ষার কি উপায়? ইংলণ্ড। শুনিয়াছি, তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য। এক বার চক্ষু বুজিয়া, সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ তোমার অসংখ্য প্রজার উদার শিক্ষায় বিন্যস্ত কর; উদার শিক্ষা বিধান দ্বারা তোমার বিংশতি কোটী প্রজাকে স্বদেশ-হিত-ব্রতে দীক্ষিত কর, তাহাদিগকে স্বদেশ-হিত-ব্রতে জীবনকে পূর্ণাহুতি দিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য আত্ম ভুলিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশের জন্য স্বদেহের রুধির বিন্দু বিন্দু করিয়া বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দাও; পিতা যেমন শিশু সন্তানকে হাঁটিতে শিখায়, তেমনই ধীরে ধীরে আমাদিগকে স্বাধীনতার পথে লইয়া চল; যখন আমাদিগকে স্বাধীন ভাবে চলিতে সমর্থ দেখিবে, তখন আমাদিগকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বন প্রদান কর, তোমার জ্যেষ্ঠের সন্ততিগণকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত কর। ইংলণ্ড! এ সৌভাগ্য কয় জনের অদৃষ্টে ঘটে? ইংলণ্ড! এই অনন্ত কীর্ত্তি তোমার হস্তেই রহিয়াছে। ইংলণ্ড! এই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক জ্যেষ্ঠ-সন্ততি-

গণের ধন, মান, প্রাণ সকলই তোমার হস্তে। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের উদার শিক্ষা বিধান পূর্ব্বক তাহাদিগকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পার, ও তাহাদিগের ন্যস্ত ধন তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে পার। আবার ইচ্ছা হইলে তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে চির অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিতে পার। একে অনন্ত কীর্ত্তি ও অক্ষয় স্বর্গ; অপরে অনন্ত অপযশ ও অনন্ত নিরয়। এক্ষণে তোমার যাহা অভিলাষ।

আবার ভারতবাসিন্! তোমায় বলি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী আমেরিকা প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তেও যদি তোমার স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত না হয়; যদি ইহাতেও তুমি একতা ও আত্মত্যাগ শিখিতে না পার, যদি ইহাতেও তোমার মনে জাতিগত ও দেশগত গৌরবের ভাব অঙ্কিত না হয়; যদি ইহাতেও তুমি প্রত্যেক ভারতবাসী ও প্রত্যেক জাতীয় ভ্রাতার জন্য ধন, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে না শিখ; যদি ইহাতেও তুমি কেবল আত্ম লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাক,—তাহা হইলে বুঝিব যে, নরকেও তোমার আর স্থান নাই। তাহা হইলে বুঝিব যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, ও আমেরিকার পবিত্র নামগ্রহণে তোমার কোন অধিকার নাই! বুঝিব, তুমি মৃণ্ময়, সুতরাং মৃৎপিণ্ডে ইংলণ্ড, ইতালী প্রভৃতির উদার শিক্ষা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইল না।

"প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।"

বিশুদ্ধ মণিই বিম্বগ্রহণে সমর্থ, মৃৎপিণ্ড কখনই প্রতিবিম্বধারণে সক্ষম নহে। জাপান সেই বিশুদ্ধ মণি, এই জন্য জাপানেই ইংলণ্ড প্রভৃতির উদার শিক্ষা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইল। ভারতবাসিন্! ইহাতেও যদি তোমার চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে, আর তোমার কোন আশা নাই।

আধুনিক ভারত। *

ভ্রাতৃগণ! আমি অদ্য অনুরুদ্ধ হইয়া আপনাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। বক্তৃতা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কারণ আমার সাহস ও শক্তি বক্তৃতার অনুকূল নহে। তবে আমার কতিপয় বন্ধুর অনুরোধ এই যে—আমি তাঁহাদিগের নিকটে যেমন হৃদয়ের কপাট খুলিয়া ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিয়া থাকি, আপনাদিগের নিকটেও আজ্ সেইরূপ নির্ম্মুক্ত ভাবে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা-বিষয়ে, দুই চারিটী কথা বলি। আমি এই গুরুতর বিষয় ভাবিতে এক দিন মাত্র সময় পাইয়াছি, সুতরাং এ প্রস্তাব যে অসম্পূর্ণ হইবে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী হইল, এই সোণার ভারত ইংরাজ-বণিক্‌দিগের হস্তগত হইয়াছিল। পলাশী-যুদ্ধের দিন হইতে ভারতের অদৃষ্ট-চক্রের গতি-পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান রাজাদিগের অত্যাচার দুর্ব্বিষহ হওয়ায়, কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু চক্রান্ত করিয়া বঙ্গের রাজমুকুট মুসলমানের মস্তক হইতে তুলিয়া ইংরাজবণিকের মস্তকে অর্পণ করেন। সকলেই জানেন, কেমন করিয়া সেই বন্যার জল সমস্ত ভারত প্লাবিত করে। সকলেই জানেন, কেমন করিয়া সেই ধূর্ত্ত বণিক্ সূচাগ্র পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়া, এক্ষণে বিশাল শালরূপে পরিণত হইয়াছেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিন্ধুর পশ্চিম উপকূল হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত এক্ষণে ইংরাজ বণিকের প্রচণ্ড প্রতাপে

* এই প্রবন্ধটী ১২৮৩ সালের হিন্দুমেলায় পঠিত হইবে বলিয়া লিখিত হয়। কিন্তু পুলিসের অদ্ভুত মহিমায় মেলাস্থলে যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার জন্য ইহা তথায় পঠিত হয় নাই।

কম্পান্বিত। ইহাঁদিগের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের ভয়ে আজ্ আমাদিগের হৃদয় এত দূর আকুলিত যে, এরূপ প্রকাশ্য স্থলে আমরা হৃদয়ের দ্বার সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া কাঁদিতেও অক্ষম। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন পূর্ব্বপ্রভু সিরাজদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, এই দুর্দ্দান্ত বণিক্‌দিগকে বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার মনে কত আশা, কত অভিলাষ ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরাজেরা যখন হিন্দুদিগের ষড়যন্ত্রে বিনাযুদ্ধে বা কাল্পনিক যুদ্ধে বঙ্গের সিংহাসন পাইলেন, তখন অবশ্যই তাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব, সেনাপতিত্ব প্রভৃতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতা বিরাজমান, তিনি ইংরাজদিগেরও অন্তরে সেই কৃতজ্ঞতার অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান অস্বাভাবিক বা অমানুষ গুণের উপর ন্যস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার একটী ভ্রম হইয়াছিল। তিনি জানিতেন না যে, যাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা উত্তেজিত করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে স্বকার্য্যসাধন হইলে উপকর্ত্তার প্রতিও বিমুখ হওয়া অতি সহজ।

তিনি ইংরাজদিগকে উপলক্ষ করিয়া মসলমান ভ্রাতৃগণের চরণে যে শৃঙ্খল পরাইতে গেলেন, ধূর্ত্ত ইংরাজদিগের বুদ্ধিকৌশলে আপনারাও সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। কান্যকুব্জাধিরাজ জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের চরণে যে শৃঙ্খল অর্পিত হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই শৃঙ্খল উন্মুক্ত না হইয়া দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়াছে। আমরা সকলেই আজ্ তাঁহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।

যৎকালে ভারত ইংরাজাধিকৃত হয়, তখন ভারতবাসিমাত্রেরই মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, ভারতে ইংলণ্ডের ন্যায় প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, যে জাতি স্বাধীনতার জন্য শ্বেতদ্বীপাধিরাজকে রাজরুধিরে অভিষিক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, সে জাতি দ্বারা জাত্যন্তরের স্বাধীনতাপহরণ অসম্ভব। সে জাতি দ্বারা জাত্যন্তরের উপকার ভিন্ন অপকার হওয়া অসম্ভব। দাসত্ব উন্মোচনের নিমিত্ত যে জাতির সহস্র সহস্র রণতরি সদা সপ্তসাগর আলো-

ডিত করিতেছে, সেই জাতি যে স্থানান্তরে দাসত্ব বীজ-বপনে এত পটু হইবেন, তাহা কে জানিতে পারিয়াছিল? কে জানিত যে, একাধারে এরূপ পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী গুণদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে?

ইংরাজেরা মনে করিতে পারেন, তাঁহারা আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছেন বলিয়া আমাদিগের মনে এরূপ ঈর্ষার ভাব উদিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। ভারত এক্ষণে যেরূপ বিচ্ছিন্নাঙ্গ ও হীনবল তাহাতে কোন প্রবলতর রাজার আশ্রয়ে থাকা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে শ্রেয়স্কর। আমরা কেবল এইমাত্র চাই, যেন সেই বৈদেশিক সাহায্য আমাদিগের ভবিষ্যজাতীয় সঞ্জীবনের প্রতিকূল না হয়। ইংরাজদিগের বর্ত্তমান ভারত-শাসনপ্রণালী যে আমাদিগের ভবিষ্য-জাতীয় সঞ্জীবনের প্রতিকূল, তাহা আমরা সহজেই দেখাইতে পারি।

যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ভারতের শাসনভার অর্পিত ছিল, তখন উক্ত কোম্পানী এই গুরুতর ভারের সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ও ব্রিটিশ সিংহাসনের নিকট দায়ী ছিলেন। তাঁহাদের ভারত প্রতিনিধি ভারতের গর্হিত শাসনের জন্য পার্লিয়ামেণ্টের নিকটে দণ্ডার্থ আনীত হইতেন। লর্ড হেষ্টিংসের বিচার তাহার নিদর্শন। তখন কোম্পানীর কর্ম্মচারীকে বিধিব কঠোর শাসন হইতে পরিরক্ষিত করায় পার্লিয়ামেণ্ট বা মন্ত্রিদলের কোনও স্বার্থসাধন হইত না, সুতরাং তাহাদিগের উপর পার্লিয়ামেণ্ট ও মন্ত্রিদলের সতত কঠোর দৃষ্টি থাকিত। এই জন্য তৎকালে কোম্পানীর প্রতিনিধি-কৃত কোন অত্যাচার তাঁহাদের নিকটে ভাল করিয়া জানাইতে পারিলে, তাহার প্রতিবিধান হইতে পারিত।

কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। এক্ষণে ভারত—মহারাণী ও পার্লিয়ামেণ্টের অব্যবহিত শাসনের অধীনে আসিয়াছে। এক্ষণে ভারত প্রতিনিধি অপরের কর্ম্মচারী নহেন, তাঁহাদিগেরই খাসের চাকর। তাঁহার গৌরব রক্ষা করা, দোষ করিলে তাঁহাকে দণ্ড হইতে উন্মুক্ত করা, এক্ষণে মহারাণী ও পার্লিয়ামেণ্টের স্বার্থ;

সুতরাং এক্ষণকার ভারত-শাসন প্রণালী যে সম্পূর্ণরূপে যথেচ্ছাচার প্রণালী হইয়া উঠিয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ গবর্ণরজেনেরল ও ষ্টেট-সেক্রেটারী যাহাই ভাল বুঝেন, তাহাই ভারতের অখণ্ডনীয় বিধি হইয়া উঠে। ইহার উপর আর আপিল নাই। দুই জন ব্যক্তির ইচ্ছাই ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর দুর্লঙ্ঘনীয় বিধি, ইহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় ভয়ে আকুলিত হয়।

আমরা স্বীকার করি, আক্‌বরের ন্যায় নরপতির হস্তে যথেচ্ছাচার-প্রণালী সমর্পিত হইলে রাজ্যের মঙ্গল বই অমঙ্গল নাই। কিন্তু ইতিহাসের আরম্ভ হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমরা কয়টী আক্‌বর প্রাপ্ত হইয়াছি? সহস্র বর্ষে একটী আক্‌বর জন্মে কি না সন্দেহ। এরূপ স্থলে আমরা দুই একটী ব্যক্তির ইচ্ছার উপর আমাদিগের ধন, প্রাণ ও মান অর্পণ করি কিরূপে? ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত আমরা দুই একটী ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করি কিরূপে? ইংরাজ রাজত্ব-কাল-মধ্যে যদি একটী আক্‌বরও আবির্ভূত হইত, তাহা হইলেও আমাদিগের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইত। যদি ইংরাজ-রাজত্ব-কালে একটী বীরবল, একটী মানসিংহ, একটী তোদরমল্ল—সেনাপতিত্ব, শাসন-কর্ত্তৃত্ব বা মন্ত্রিত্ব-পদে অভিষিক্ত হইতেন, তাহা হইলেও আমাদিগের মনে এক দিন আশার সঞ্চার হইত। কিন্তু সমস্ত ইংরাজ-ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত একটীও দেখা যায় না। তবে আমরা মনকে কি বলিয়া প্রবোধ দিই? আমাদিগকে কোন নূতন স্বত্ব প্রদান করা দূরে থাকুক, আমরা দেখিতেছি যে, একটী একটী করিয়া আমাদিগের স্বভাব-দত্ত স্বত্ব অপহৃত হইতেছে। কাল বলিলেন, তোমাদিগকে এই এই স্বত্ব প্রদান করা যাইবেক; আজ্ বলিলেন, না—তোমরা অদ্যাপি উপযুক্ত হও নাই, সুতরাং এক্ষণে তোমাদিগকে সে সকল স্বত্ব প্রদান করা যাইতে পারে না, যদি কখন উপযুক্ত হও, তবে পরে বিবেচনা করা যাইবে। ১৮৫৮ সালে সিপাহি-বিদ্রোহের পর শান্তি সংস্থাপনের জন্য রাজ্ঞী বলিলেন, "অতঃপর জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ভেদ না করিয়া শুদ্ধ গুণ বিচার

পূর্ব্বক তোমাদিগকে রাজ্যের উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠাপিত করা যাইবেক। এখন হইতে ভারতবাসী ও ব্রিটনবাসী বলিয়া কোন বিষয়েই কোন প্রভেদ করা যাইবে না।" প্রজারা কিছু দিন মুগ্ধ আশ্বাসে রহিল; ভাবিল তাহাদের আরাধ্য রাজ্ঞীর বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সেই ভ্রম বিদূরিত হইল। বিংশতি বৎসর অতীত হইল, তথাপি তাহারা রাজ্ঞীর বাক্য কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিল না। আজ হইবে, কাল হইবে, এরূপ লুব্ধ আশ্বাসে রহিয়াছে, এমন সময়ে দিল্লীর দরবার আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই ভাবিল যে, এই শুভ লগ্নে রাজ্ঞী তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবেন। অসংখ্য প্রজা নব নব স্বত্ব-লাভের আশায় দিল্লীর অভিমুখে, বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায়, ধাবিত হইল। কত ব্যক্তির অন্তরে কত আশা, কত অভিলাষ, ও কত উৎসাহ। রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, রাজা মহারাজা, আমীর ওমরা সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, ভারতে কি এক নবীন সৌভাগ্যের দিন অভ্যুদিত হইবে। ব্যক্তিগত ও জাতীয় আশায় সকলেরই অন্তর আপ্লুত। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে নৃত্য, গীত ও মহোৎসব। মুগ্ধ আশ্বাসে সমস্ত ভারত যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। সামান্য প্রজা হইতে মহারাজা পর্য্যন্ত সকলেরই গৃহে মহা সমারোহ উপস্থিত হইল। আমাদিগের ভয় হইল, বুঝি ভারতের মস্তিষ্কে কোন বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই বিশ্বব্যাপী আনন্দোৎসবের পরিণাম কি হইল, না—দুই চারি জন ভারতবাসী রায়বাহাদুর রঙ্গে অভিরঞ্জিত হইলেন। দুই চারি জন রায়বাহাদুর ও রাজাবাহাদুর হইলেন। দুই চারি জন রাজাবাহাদুর মহারাজ হইলেন। যাঁহারা ঊনবিংশ তোপ পাইতেন, তাঁহারা একবিংশ তোপ পাইলেন, যিনি একবিংশ তোপ পাইতেন, তাঁহার একত্রিংশ তোপ হইল, যিনি তোপ পাইতেন না, তাঁহার ত্রয়োদশ তোপ হইল, মহারাণীর এক শত এক তোপ হইল। স্বাধীন রাজাদিগের কণ্ঠে অধীনতাপদক লম্বমান হইল, তাঁহারা রাজা হইতে উচ্চতম পদ সেনাপতিত্বে বৃত হইলেন! অবশেষে শ্রাদ্ধের চূড়ান্ত পরিণামস্বরূপ লর্ড লীটন স্বাধীন রাজাদিগকে

এই মর্ম্মে বলিলেন—তোমরা আর এখন হইতে স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবে না, তোমরা এখন হইতে মহারাণীর মন্ত্রি-সভার সভ্যমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহাতেও তোমরা যদি আপন ইচ্ছায় রাজভক্ত না হও, তাহা হইলে, তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক রাজভক্ত করিব। আর প্রজা-সাধারণ! তোমরা অদ্যাপি কোন কার্য্যেরই হও নাই, সুতরাং এক্ষণে তোমাদিগের কোন উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ার ইচ্ছার ন্যায় হাস্যাস্পদ হইবে। তোমরা এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা করিও না। আমরা যে দুই চারি টাকা অনুগ্রহ করিয়া দিতেছি, তাহাতেই তোমরা এক শাঁজ করিয়া খাইয়া কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট থাক। মহারাণী তোমাদিগকে পূর্ব্বে যে আশ্বাস-বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন, সে আশ্বাস-বাক্যে আপাততঃ মুগ্ধ হইও না। তোমরা যদি কখন উপযুক্ত হও, তাহা হইলে, মহারাণীর সে কথা বিচার করা যাইবেক। আর তোমরা উপযুক্ত হইয়াছ কি না, সে বিচারের ভার আমাদিগেরই হাতে এবং আমরাও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তোমাদিগকে উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিব না। ইহাতেও তোমরা যদি রাজভক্ত না হও, তাহা হইলে, তোমাদিগকেও বলপূর্ব্বক রাজভক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

মহারাণীর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের বক্তৃতায় আমাদিগের মনে যে কিছু আশা ভরসা হইয়াছিল, লর্ড লাটনের দিল্লীর বক্তৃতায় আমাদিগের সে সমস্ত আশা একেবারে সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। প্রলয়-ঝটিকার পর যে স্তব্ধভাব, আমাদিগের হৃদয়ের এক্ষণে ঠিক সেই স্তব্ধভাব। আমরা কোন্ দিকে যাইব, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যে দুই চারি জন উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন ভারতের আর সমস্ত অধিবাসীই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। সকলেই কোন না কোন প্রকারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সকলে যেন এতদিন মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, এত দিন পরে যেন তাঁহাদের চৈতন্য হইল। চৈতন্যলাভের পর সকলেরই মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল, "ইংরাজরাজত্বে আমাদের কি আশা?" ইংরাজদিগের সহিত স্বাধীন বাণিজ্য-যুদ্ধে ভারতের

বাণিজ্য-প্রতিভা অঙ্কুরে বিদলিত হইল। শিল্পও ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিল। ভারতের যে বস্ত্র ও অলঙ্কার জগতের বিস্ময়োদ্দীপক ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে অবমানিত ও অধঃকৃত হইল, সুতরাং কর্ম্মকার ও তন্তুবায়-কুল একেবারে উৎসন্ন হইয়া পড়িল। যে অর্থে অসংখ্য ভারতীয় শিল্পীরা প্রতিপালিত হইতে পারিত, সেই অর্থে এক্ষণে অসংখ্য বৈদেশিক শ্রমোপজীবী প্রতিপালিত হইতেছে। এক দিকে ভারতের শিল্পীরা দিন দিন শুদ্ধ উদরান্নের জন্য লালায়িত হইতেছে, অন্য দিকে বৈদেশিক শিল্পীরা দিন দিন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পড়িতেছে। শিল্প ও বাণিজ্য ত এই রূপে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে কৃষিই সাধারণ লোকের জীবন-ধারণের একমাত্র উপায় রহিয়াছে। কিন্তু ইহাও অর্থসাধ্য। অর্থাভাবে কৃষকেরা ইহারও উন্নতিসাধন করিতে পারিতেছে না। মহাত্মা আকবর তাঁহার করসংগ্রাহকদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন কৃষকদিগকে প্রয়োজন হইলেই অর্থসাহায্য করেন, তাঁহারা যেন সকল অবস্থাতেই তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বতোভাবে তাহাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে সচেষ্ট হন। কই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ত কলেক্টরদিগের প্রতি এরূপ কোন আদেশ প্রদান করেন নাই, অথবা যদি করিয়া থাকেন, তাহা ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের ত এই দশা গেল। আমাদিগের একমাত্র আশা ছিল, রাজকর্ম্ম। লর্ড লীটনের বক্তৃতাও সেই চিরলালিত আশালতাকেও সমূলে উন্মূলিত করিল। এক্ষণে আমরা করি কি, যাই বা কোথায়? আমরা প্রতি বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অসংখ্য ছাত্রকে প্রশংসাপত্র সহ বহির্গত হইতে দেখিতেছি। আমাদিগের প্রথমে ইহাতে বড়ই আনন্দ বোধ হইত। কিন্তু এক্ষণে এই শোচনীয় দৃশ্যে আমাদিগের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ পরীক্ষা দিয়া বহির্গত হইয়াছিলাম, তখন আমাদিগের মনে কতই আশা, কতই উৎসাহ ছিল। তখন স্বদেশের "এ করিব" "ও করিব" বলিয়া আমাদিগের মনে কত-প্রকার ইচ্ছা হইত, কিন্তু এক্ষণে—

"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"

দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় সেই সকল ইচ্ছা আমাদিগের হৃদয়ে উত্থিত হইয়াই অন্তর্লীন হইতেছে। আমাদিগের জ্ঞান, আমাদিগের শিক্ষা, আমাদিগের কেবল যাতনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি, এই সকল কার্য্য করিলে আমাদের জাতীয় গৌরব ও মনুষ্য-নামের মহত্ত্ব পরিরক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যে যে উপায়ে আমরা সে সকল করিতে সমর্থ, আমরা সে সকল উপায়ে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। আমরা সকলের ঘৃণার কারণ হইয়াছি, যেহেতু আমরা চাকরী ও ওকালতী-প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোন জীবিকা অবলম্বন করি না। কিন্তু আমরা জানি না যে, চাকরী ও ওকালতী প্রভৃতি ভিন্ন আমরা অন্য কোন্ জীবিকা অবলম্বন করিতে পারি? আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে যাহা করিয়া দিতেছে, তাহা ভিন্ন আমরা আর কি হইতে পারি? আমরা অন্য যে দিকেই যাইব, সেই দিকেই মূল-ধনের প্রয়োজন। মূলধন আমাদের নাই। আমাদের ধনি-বৃন্দও নিতান্ত স্বার্থপর। তাঁহারা সঞ্চিত অর্থ কেবল আপনাদিগের বৃথা আমোদ-প্রমোদে ব্যয়িত করিয়া থাকেন। তদবশিষ্ট যাহা থাকে, তদ্দ্বারা অল্প সুদে গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করিবেন, তথাপি অধিক-লাভকর বহির্বাণিজ্য, কৃষি বা শিল্পে প্রযুক্ত করিবেন না। তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও অধিকতর লাভ হইতে পারে এবং দেশীয় মস্তিষ্ক পরিচালিত ও দেশীয় শোণিত পরিপোষিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিবেন কেন? উদরান্নের জন্য তাঁহাদিগকে ত লালায়িত হইতে হয় না। তাঁহাদিগের স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের দুরবস্থার সহিত তাঁহাদিগের কি সম্বন্ধ আছে যে, তাঁহাদিগের সঞ্চিত ধন তাঁহারা এরূপ সংশয়িত কার্য্যে প্রযুক্ত করিবেন? এক দিকে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা, সেইরূপ অন্য দিকে মূল-ধনের সমূলে বিনষ্ট হওয়ারও সম্ভা-বনা রহিয়াছে। এরূপ স্থলে তাঁহারা কি জন্য এরূপ অসমসাহসি-কতায় প্রবৃত্ত হইবেন? সুতরাং অধিকতর লাভের আশা দেখাইয়া

তাঁহাদিগকে ইহাতে প্রবৃত্ত করা অসম্ভব। তাঁহাদিগের অন্তর যদি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের দুরবস্থা দেখিয়া আপনি না কাঁদে, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে ইহাতে প্রবৃত্ত করে কাহার সাধ্য? কিন্তু কবে যে তাঁহাদিগের অন্তর স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের জন্য কাঁদিবে, আমরা জানি না; এবং তাহা না হইলেও আমাদিগের সুশিক্ষিত দলের আর কোন আশা নাই।

সুতরাং একটীমাত্র দ্বার সুশিক্ষিতদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া মসীমর্দ্দন ও মস্তিষ্ক পরিচালন দ্বারা জীবন দগ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু সরস্বতীর বরপুত্রদিগের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া কেহ সহজে এ পথে অগ্রসর হইতে চাহেন না। এই ব্যবসায়ে দুই চারি জনকে সৌভাগ্যশালী হইতেও দেখা গিয়াছে সত্য, কিন্তু এই ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীদিগের সাধারণ অবস্থা অতি শোচনীয়। বাঙ্গালাভাষা যেরূপ সর্ব্বতঃ অনাদৃত, তাহাতে নবন্যাস, নাটক ও স্কুল বই ব্যতীত ইহাতে অন্য কোন গ্রন্থ লিখিলে মুদ্রাঙ্কন-ব্যয়-পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইয়া উঠা দুরূহ। নবন্যাস, নাটক ও স্কুল বইয়ে কিঞ্চিৎ লাভ হয় বলিয়া, অধিকাংশ গ্রন্থকারই সেই দিকে ঝুঁকিয়াছেন। এই কারণে এই শ্রেণীর গ্রন্থকারদিগের আয়ও ক্রমে সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া কমিয়া যাইতেছে। এ ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু প্রতিযোগিতাক্ষেত্র পূর্ব্ববৎ একইরূপ সঙ্কীর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের ন্যায় এই শ্রেণীর গ্রন্থকারেরা পরস্পরের মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে আবার বৈদেশিক অর্থলোলুপ গ্রন্থকারেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা পুস্তকের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা নানাপ্রকারে আমাদিগের শোণিত শোষণ করিতেছেন, আমাদিগের মাংসে তাঁহাদিগের উদর পরিপূরিত করিতেছেন, আমাদিগকে কঙ্কালমাত্রে পরিশিষ্ট করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি ও নিবৃত্তি নাই। যখন এদেশীয় গ্রন্থকারেরা অন্ন বিনা মারা যাইতেছেন, যখন দুর্ভিক্ষের জ্বালায় তাঁহারা পরস্পরের মুখের গ্রাস পরস্পরের মুখ

হইতে কাড়িয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন, সেই ভীষণ যাতনার সময়ে তাঁহারা কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পুস্তক-নির্ব্বাচন বিষয়ে তাঁহাদিগেরই হাত, সুতরাং তাঁহারা অনায়াসে নিরুপায় বাঙ্গালীকে পরাস্ত করিয়া আপনাদের অভীষ্টসাধন করিতেছেন। গ্রন্থকারদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ লাভ ছিল, তাঁহাদিগের ত দশা পরিণাম এই হইল। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার আছেন, তাঁহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহাঁরা সাধারণতঃ সম্পাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা সাময়িক পত্রের প্রচার দ্বারা পৈতৃক ধনের বা স্বোপার্জ্জিত অর্থের ধ্বংস করিয়া থাকেন। দেশের মঙ্গল সাধন করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু দেশের মঙ্গল সংসাধিত হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের নিজের অমঙ্গল নিশ্চিত। ক্রমে তাঁহাদিগের মনের স্বাধীনবৃত্তি সকল এত দূর তেজস্বিনী হইয়া উঠে যে, তাঁহারা ক্রমে পরের উপাসনা ও পরের দাসত্ব করিতে অক্ষম হইয়া উঠেন। কিন্তু সাহেবের উপাসনা ও সাহেবের দাসত্ব ব্যতীত আজ্ কাল যে অর্থসম্বন্ধে আমাদিগের কোন উন্নতির আশা নাই, তাহা বলা কেবল বাহুল্যমাত্র। সেই সাহেবদিগের সহিত সম্পাদকদিগের চিরশত্রুতা দাঁড়াইয়া যায়। তাঁহারা অনেক সময়ে সাহেবের বিচার-কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান। এই জন্য সাহেবদিগের অধীনে চাকরী করাও তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে। এই জন্য তাঁহাদিগের অর্থবিষয়ক উন্নতির দ্বার এক-প্রকার রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যে দেশের উন্নতি-সাধন করিবেন বলিয়া, তাঁহারা নিজের উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দেন, সে দেশের লোকের তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার? নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদকদিগের উৎসাহ-বর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, কাগজ লইয়া তাঁহারা অনেকেই দাম দিতে চাহেন না। সম্পাদকেরা যে কি খাইয়া তাঁহাদিগের জন্য লড়িবে, তাহা তাঁহারা এক বারও ভাবিয়া দেখেন না। সম্পাদকদিগের নিজের উদর পূরণ করা দূরে থাকুক, কি দিয়া তাঁহারা মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিবেন, তাহাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। স্বদেশীয় রাজা হইলে, সম্পাদকদিগের

সহিত রাজার সহযোগিতা হইতে পারিত; কিন্তু বৈদেশিক রাজার সহিত সম্পাদকদিগের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিযোগিতা। সুতরাং তাঁহাদিগের রাজার নিকটে কোন উৎসাহ পাইবার আশা নাই। তাঁহাদিগের একমাত্র আশাস্থল স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সম্পাদকদিগের কষ্টে স্বদেশবাসিগণের হৃদয় বিচলিত হয় না। সুতরাং সম্পাদকদিগের ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার আছেন, যাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থ নবন্যাস, নাটক বা স্কুলের বই এ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত উচ্চদরের পুস্তক লিখিয়া থাকেন। ইহাঁদিগেরও দশা সম্পাদকদিগের ন্যায়, সুতরাং ইহাঁদিগের বিষয় আর অধিক করিয়া বলা বাহুল্য। সুতরাং এ জীবিকা সাধারণের প্রলোভনীয় হইতে পারে না। সুশিক্ষিত দলের সম্মুখে আর কোন স্বাধীন জীবিকাদ্বার উন্মুক্ত আছে কি না, আমরা জানি না।

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি না থাকায় আজ্ আমাদের এই দশা। এখনই আমাদিগের দুরবস্থার পরিসীমা নাই। এর পর আরও কি হইবে, ভাবিতে গেলে ভয় হয়। আমাদিগের পুত্র পৌত্র-দিগের যে কি দশা হইবে, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। ক্রমে শিক্ষার ব্যয় গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এক জন ভদ্র-বংশোদ্ভব কেরাণীর বেতন বিশ টাকা, কিন্তু পুত্রের সংখ্যা পাঁচটী। পাঁচ-টীকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইতে হইলে, তাহাদের বিদ্যালয়ের বেতন দিতে হইলেই, তাঁহার নিজের বেতন পর্য্যবসিত হয়। মূর্খ করিয়া রাখিলেও তাহারা চিরজীবন গলগ্রহস্বরূপ হইবে এবং সমাজে তাহাদিগকে লইয়া তাঁহাকে সতত অবমানিত হইতে হইবে, সুতরাং তাহাদিগকে মূর্খ করিয়াও রাখিতে পারেন না। এস্থলে তিনি কি করেন? কেরাণীর উপরি লাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অগত্যা তাঁহাকে পরের শরণাপন্ন হইতে হয়। এক জন এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধ-সংখ্যা এক শত টাকা বেতন হইল। অসংখ্য নিরন্ন কুটুম্ব আসিয়া তাঁহার গল-লগ্ন হইল। স্নেহ-কোমল হিন্দুহৃদয়

আত্মীয় স্বজনের দুঃখে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সোণামুখ করিয়া সেই গুরুভার বহন করিতে লাগিলেন। যত দিন তাঁহার পুত্রাদি না হইল, তত দিন তিনি দুঃখে কষ্টে সেই গুরুভার কথঞ্চিৎ বহন করিতে পারিলেন, কিন্তু সন্তানাদি হইবামাত্র নানা-প্রকার খরচ বাড়িয়া গেল, যে আত্মীয় স্বজনের গুরুভার মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বলিতে পারেন না, অথচ দেখিতেছেন, তাঁহার আয়েও সঙ্কুলান হয় না। সাহেবের নিকট বলিলেন, "সাহেব! এক শত টাকায় আর কুলায় না।" সাহেব পূর্ব্বসংস্কার মনে করিয়া আছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন, তখন শুনিয়াছিলেন, এক শত টাকায় এক জন বাঙ্গালী ভদ্র লোকের বেশ চলিতে পারে। সেই পূর্ব্বসংস্কার তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। এদিকে তাঁহারা আসিয়া আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। আগে আমাদের এক খানি ধুতি ও এক খানি চাদর হইলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের বুট জুতা চাই, ষ্টকিং চাই, পিরান চাই, চাদর চাই, আবার বাহিরে যাইতে হইলে ইহার উপর পেণ্টুলেন, চাপকান, টুপি বা পাকড়ী প্রভৃতি আসবাব চাই। এ সকল না হইলে আবার সাহেব! তুমি আমাদিগকে তোমার নিকটে যাইতে দিবে না। বাটীর কর্ত্তা যখন এই সকল পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন, তখন যে, বাটীর অন্যান্য লোক কিয়ৎ পরিমাণেও তাঁহার অনুকরণ করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রত্যেকের এক দফা করিয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইলে গড়ে দশ টাকা করিয়া পড়িয়া যায়। ইহার উপর আবার প্রত্যেক প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ করিয়া বাড়িয়াছে। এসকল কারণ-সত্ত্বেও সাহেব বলিলেন, "এক শত টাকায় বেশ চলিতে পারে।" বেশী পীড়াপীড়ি করিলে বলেন যে, "ইহাতে সন্তুষ্ট না হও, উন্নতির অন্য চেষ্টা দেখ।"

যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার উচ্চতম শাখায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ত এই দশা। যাঁহাদিগের ইহার মধ্যে পদস্খলন হয়, তাঁহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইতে পারিলেন না, তিনি ত মনুষ্য-মধ্যেই পরিগণিত হইলেন না। ১০টাকার চাকরীর জন্য তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়। যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার মাসিক উর্দ্ধসংখ্যা ১৫ টাকার সংস্থান হইল। যিনি এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার উর্দ্ধসংখ্যা মাসিক ২৫ টাকার সংস্থান হইল; এবং যিনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন তাঁহার উর্দ্ধসংখ্যা ৫০ টাকার সংস্থান হইল। বাজারের দর ক্রমেই কমিতেছে। ক্রমেই কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ২০ বৎসর পরে যে কি হইবে, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় বিকম্পিত হয়। যাঁহারা বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা পাইতেছেন, তাঁহাদিগের ত এই দশা। আবার যে সকল ভদ্র সন্তান অবস্থার দোষে ইংরাজী শিক্ষা পাইতে পারেন নাই, অথচ হলচালন করিতেও অক্ষম, তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাঁহারা বলেন যে তাঁহারা হলচালন করেন না কেন তাঁহারা অতিশয় মূর্খ। অধিকতর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমসহিষ্ণু কৃষকদিগের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করা দুর্ব্বলতর ও শারীরিক পরিশ্রমকাতর ভদ্রসন্তানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আর কৃষকদিগের অবস্থা এত কি লোভনীয় যে তাহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমরে ভদ্রসন্ততিগণের অবতরণ করা উচিত। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারি যে, টাকার সুদ ও খরচা বাদে কৃষকের গড়ে মাসিক ৫, টাকার উর্দ্ধ লাভ হয় না। এক জন মধ্যবিৎ লোকের ৫, টাকায় কখন সংসার চলে না। এরূপ স্থলে তাঁহারা কি করিবেন? হয় তাঁহাদিগকে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে, নয় ভিক্ষাব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ জীবিকা যে কিরূপ ক্লেশকর, তাহা যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। এই ভীষণ অন্নযুদ্ধের সময় আবার লর্ড লীটন কর্ত্তৃক আশার মূলে কুঠারাঘাত। ভারতবাসীর মনে আশা ছিল যে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা রাজ্যের অধিকাংশ উচ্চ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে ক্রমে ক্রমে ভারতে শ্বেতাঙ্গের আমদানী কমিয়া যাইবে। কিন্তু এক্ষণে সে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছে, সে আশা

সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে ইংরাজেরা সহজে আমাদিগের মুখের গ্রাস আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন না।

এই নিরাশ সময়ে আমাদিগের একটী মাত্র উপায় করতলস্থ রহিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলে সেই উপায় দ্বারা বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, ইংরাজদিগের উপর জয়লাভ করিতে পারি। এই উপায় একতা ও আত্মত্যাগ। ইংরাজ জাতি অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয়, এই জন্য সাধারণ মতকে (Public opinion) ইহাঁরা বিশেষ মান্য করিয়া থাকেন। সমস্ত ভারতবাসী যদি একস্বর হইয়া ইংলণ্ডের নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করিতে পারেন, ইংলণ্ড সে প্রার্থনা কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ডের এ ঔদার্য্য ও এ মহত্ত্ব আছে। সমস্ত ভারতবাসীর একস্বর হইতে হইলে তাঁহাদিগকে অগ্রে একত্র মিলিত হইতে হইবে। বিংশতি ক্রোটী ভারতবাসী যদি বৎসরে অন্তত: এক দিনও জাতি, ধর্ম্ম, সমাজের পার্থক্য ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হওয়ার আর বিলম্ব নাই। ভারতের সমস্ত অধিবাসী বৎসরে অন্ততঃ এক দিনও একত্র মিলিত হইতে পারেন, এমন একটী উপলক্ষ চাই, এমন একটী স্থান চাই। আমরা মেলার অধ্যক্ষদিগের নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই, তাঁহারা যেন এই মেলাকে কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত না করেন। আমাদিগের ভিক্ষা তাঁহারা যেন এই মেলাকে এখন হইতে হিন্দু-মেলা নাম না দিয়া ভারত-মেলা নাম দেন। যেন ইহা এখন হইতে ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসব-স্থল হয়। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাতে যোগ না দেন—আমরা কাঁদিব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ রাখিব না। আমরা সকলকেই ইহার অভ্যন্তরে আহ্বান করিব। আমরা কোন-ক্রমেই দলাদলির ভিতর যাইব না। দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা আর তাহার শরণাপন্ন হইব না।

ভারতবাসী! হৃদয়ের প্রিয়তম বন্ধু!—আসুন, আমরা এই প্রস্তাবিত প্রকাণ্ড ভারতবর্ষীয় মেলায় একত্র মিলিত হইয়া একতানে সমস্বরে একবার ইংলণ্ডের নিকট আমাদিগের অপহৃত স্বত্ব যাচ্ঞা করি। ইংলণ্ড সমস্ত ভারতবাসীর মিলিত ক্রন্দনে কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইংলণ্ডকে স্বার্থত্যাগ করিতে অনুরোধ করার পূর্ব্বে আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে হইবে যে আমরা স্বদেশবাসীর জন্য—প্রিয়তম ভ্রাতার জন্য—আত্মত্যাগ করিতে সমর্থ। আমাদিগের নিজের নৈতিক উৎকর্ষ দেখাইয়া আমরা ইংরাজদিগের নিকট নৈতিক উৎকর্ষ ভিক্ষা করিব। ভারতবাসী ধনিক-বৃন্দ! আপনাদিগের নিকটে করযোড়ে আমরা এই ভিক্ষা করিতেছি যে সাধারণের উপকারার্থ অপনারা প্রত্যেকে এই জাতীয় সভায় আপনাদিগের বিপুল আয়ের কিয়দংশ অর্পণ করুন। যদি ভারতকে আবার একটী জাতি করিতে চাহেন, তবে কিয়ৎ পরিমাণে স্বার্থবিহীন হউন, কিয়ৎ পরিমাণে আপনাদিগের বিলাসিতা ভুলিয়া যাউন। স্বার্থপরতা ও বিলাসিতায় কখন জাতীয়-উদ্ধার সাধন হইতে পারে না। যখন অসংখ্য ভ্রাতা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, তখন্ আপনারা কোন্ প্রাণে আত্মসুখে নিমগ্ন থাকিবেন? এ সুখের সময় নয়! জাতীয় মৃত্যু সন্নিকট! এ সময়ে শেষ চেষ্টা করুন, নতুবা আর কিছু দিন পরে সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। মৃতদেহে ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় তখন ইহা নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইবে। আপনাদিগের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ইংরেজদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা দিউন। দেখিবেন সেই দৃষ্টান্তের বলে ইংরাজদিগের পাষাণহৃদয়ও বিচলিত হইবে!

——

অতীত ও বর্ত্তমান ভারত।

অতীতের সহিত তুলনায় আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মনৈতিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা, বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণানুসন্ধান ও তদপনোদনের উপায় চিন্তন—এই প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। এই কয়টী গুরুতর বিষয় একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নিঃশেষিতরূপে সমালোচিত ও পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হইতে পারে না। তথাপি যতদূর সাধ্য আমি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিব।

আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা কি, তাহার কারণই বা কি, এবং তদপনোদনের উপায়ই বা কি? জানি, এ প্রশ্নের উত্তরে নানা প্রকার মতভেদ আছে কিন্তু মতভেদ আছে, বলিয়া আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে নিজের মত বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।

মানব সমাজে সভ্যতা ও উন্নতির ক্রম পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সাম্য মানব জাতির আদিম অবস্থা, বৈষম্য সভ্যতার ফল। আদিম অবস্থায় যখন প্রত্যেক মনুষ্যই প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত মৃগয়া প্রভৃতি একইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবন ধারণ করিত, তখন তাহাদের মধ্যে যে কোন বৈষম্য ছিল না ইহা বলা বাহুল্য। পরে যখন মানব জীবনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যানুষ্ঠান সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে লাগিল তখন হইতে বৈষম্যের সূত্র আরম্ভ হইল। কার্য্য সকলের স্বাতন্ত্র্য হইতে কার্য্যকারকদিগের স্বাতন্ত্র্য আরম্ভ হইল। স্পেন্সর প্রভৃতি দার্শনিকেরা সভ্যতা ও কার্য্য সকলের স্বতন্ত্রীকরণ একই অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন যেমন নিম্নতর জীবের জীবনী ক্রিয়া সকল সর্ব্বশরীরে সমভাবে ব্যাপ্ত থাকে, আর সেই ক্রিয়া সকল শরীরের স্থানবিশেষে যত সীমাবদ্ধ হইতে থাকে ততই জীব নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণীতে উঠে; তেমনই মানব জীবনের ক্রিয়া সকল যতই বিভক্ত হইয়া ব্যক্তি বা

শ্রেণী বিশেষে আবদ্ধ হইতে থাকে, ততই মানবের উন্নতি, ততই সভ্যতার বৃদ্ধি। ফলতঃ কার্য্য সকলের স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন মানব জাতির উন্নতি অসম্ভব, এবং এই স্বাতন্ত্র্য হইতে কার্য্য-কারকদিগের যে স্বাতন্ত্র্য তাহাও অপরিহার্য্য। কিন্তু যখন এই স্বাতন্ত্র্য কার্য্যসকলের বিভিন্নতা-রূপ কারণ অতিক্রম করে বা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইয়া অন্যারূপ ধারণ করে, তখনই তাহা হইতে বৈষম্যের উৎপত্তি হয়। এই বৈষম্যই নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে সভ্যতা-স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। যেমন উচ্চতম জীবে জীবনী ক্রিয়া সকল স্থান বিশেষে বিভক্ত হইয়া সকলই এক উদ্দেশে পরস্পরের সহায়স্বরূপ হইয়া কার্য্য করে, একটী প্রতিকূলে দাঁড়াইলে হয়ত সমস্ত জীবনী শক্তি লুপ্ত হয়, সেইরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যকারক একই উদ্দেশে পরস্পরের সহায় হইয়া কার্য্য না করিলে উন্নতির জীবন লুপ্ত হয়। বস্তুতঃ কার্য্যকারকদিগের পরস্পর-সহকারিতার অভাবেই সমাজে নানাপ্রকার অশুভকর বৈষম্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই বৈষম্য হইতেই জাতির পতন হয়। ভারতেও সেই কারণে নানাবিধ বৈষম্য ঘটিয়াছে। সেই বিবিধ বৈষম্য হইতেই ভারতের পতন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, সেই বিবিধ বৈষম্য কি কি।

উত্তর—বর্ণ-বৈষম্য, জাতিবৈষম্য, ধর্ম্মবৈষম্য, পরিচ্ছদবৈষম্য, ভাষাবৈষম্য, শাসনবৈষম্য, ধন-বৈষম্য ও স্ত্রীপুরুষবৈষম্য।

তন্মধ্যে বর্ণ-বৈষম্যই ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের প্রথম ও প্রধান কারণ। যখন প্রাচীন আর্য্যেরা সিন্ধু পার হইয়া সপ্তনদবিধৌত প্রদেশে অসংখ্য অনার্য্য শত্রুর সম্মুখীন হন, তখন কার্য্য সৌকর্য্যার্থে তাঁহারা আপনাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যাঁহাদিগের উপর মন্ত্রণাবিভাগ অর্পিত হয় তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হয়েন; যাঁহাদিগের উপর সমরবিভাগ অর্পিত হয় তাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে আখ্যাত হয়েন, এবং যাঁহাদিগের উপর বাণিজ্যবিভাগ অর্পিত হয় তাঁহারা বৈশ্য নামে আখ্যাত হয়েন। যদি বৈশ্যেরা পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন যে সাময়িক প্রয়োজনানুসারে বাণিজ্যবিভাগের ভার গ্রহণ করায়

অপবাধে তাঁহাদিগকে চিবকাল বর্ণদ্বয়ের দাসত্ব করিতে হইবে এবং যদি ক্ষত্রিয়েবা জানিতে পাবিতেন যে সমরক্ষেত্রে নামিয়া নিজ রুধিব ব্যযেও শত্রু নিপাত কবাব অপবাধে তাঁহাদিগকে চিবকাল ব্রাহ্মণদিগেব অধঃস্থ থাকিতে হইবে তাহা হইলে তাঁহাবা কখনই এরূপ শ্রমবিভাগ সম্মত হইতেন না। নিশ্চয়ই এই কার্য্যবিভাগ লইয়া প্রথমেই তাঁহাদিগেব মধ্যে ঘোবতব অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইত। তৎকালে এরূপ শ্রেণীবিভাগ পুরুষানুক্রমিক বলিয়া স্থিবীকৃত হয় নাই। যাঁহাদিগেব চিন্তাশক্তি বলবতী ও যাঁহাদিগেব বুদ্ধি সূক্ষ্মার্থদর্শিনী—তাঁহাদিগেব উপব মন্ত্রণাবিভাগ ন্যস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ কোন চিবন্তন নিয়ম সংস্থাপিত হয় নাই যে অন্য বিভাগেব লোক চিন্তাশক্তিব উৎকর্ষ ও বুদ্ধিব প্রাখর্য্য দেখাইয়া মন্ত্রণাবিভাগে আসিতে ইচ্ছা কবিলে তথায় আসিতে পাবিবে না, অথবা আদি ব্রাহ্মণগণেব পুত্রপৌত্রাদিগণকে চিন্তাশক্তিহীন ও স্থূলবুদ্ধি হইলেও প্রথম শ্রেণীতে বাখিতেই হইবে। এরূপ চিবন্তন নিয়ম ব্রাহ্মণদিগেব কূটমন্ত্রণাজালেব পবিণত ফল। এইরূপে আর্য্যজাতিব মধ্যে বর্ণবৈষম্য প্রয়োজনীয়, সাময়িক ও শুভপ্রদ হইতে কালে অপ্রয়োজনীয়, চিবন্তন ও অশুভপ্রদ হইয়া উঠিল। এইরূপে ব্রাহ্মণদিগেব বুদ্ধিকৌশলে আর্য্যজাতি বোমেব পেট্রিসীয ও প্লীবীয় শ্রেণীদ্বযেব ন্যায় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বর্ণে বিভক্ত হইলেন। ক্রমে বিজযেব গতিতে একটী অনার্য্য জাতি আসিয়া এই আর্য্য স্রোতস্বিনীব সহিত মিলিত হইল। মিলিত হইল বটে, কিন্তু ইহা পূর্ণ মিলন নহে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমেব ন্যায় এই সঙ্গমেব শ্বেতকৃষ্ণ বেখা অদ্যাপিও বিলীন হইল না। আর্য্যজাতি পবাজিত আদিমনিবাসীদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্ম সম্প্রদায়েব অন্তর্ভুক্ত কবিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে বাজনৈতিক বা সামাজিক সাম্য প্রদান কবিলেন না। ইহাদিগকে শূদ্র বা দাস আখ্যা দিয়া একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পবিণত কবিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেব উপব ব্রাহ্মণেব প্রভুত্ব তত দূব খাটে নাই। কারণ এই তিন বর্ণই একজাতি-সম্ভূত, এবং এই তিন ভারতের বিজেতা। সুতরাং ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয় ও

বৈশ্যের কিঞ্চিৎ মুখাপেক্ষা করিয়া চলিতে হইত। কিন্তু শূদ্রদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সেরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল না। শূদ্রেরা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণদিগের দাসরূপে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইল। সেই সময় হইতেই আর্য্যক্ষেত্রে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইল।

এই আর্য্য-উপনিবেশের সহিত আমেরিকায় ইংরাজোপনিবেশ ও ইংলণ্ডে সাক্ষণ ও নর্ম্মান্ উপনিবেশের অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। আমেরিকায় ইংরাজেরা ভারতীয় আর্য্যদিগের ন্যায় মহত্ব প্রকাশ করিয়া বিজিতদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা আদিম নিবাসীদিগকে সমূল বিনষ্ট করিয়া বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বিজিত জাতি বৈষম্যপীড়িত হইলে ক্রমেই অবনতিসোপানে নামিতে থাকে, এবং সেই অবনমন কালে প্রক্ষেপ্তা বিজয়ী জাতিকেও সঙ্গে সঙ্গে নামাইতে থাকে। বিজিতদিগের সংখ্যাবল অধিক, সুতরাং ক্রমে তাহারা অল্পসংখ্যক বিজয়ীকে আপনাদিগের অধঃপতনের সঙ্গী করিয়া লইতে সমর্থ হয়। আমেরিক ইংরাজেরা তাঁহাদিগের আসুরিক ঘাতকতার গুণে এই বিশ্বজনীন অবনতির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। জাতীয় বৈষম্যের বীজ রোপিত হয় নাই-বলিয়াই, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের আজ এত উন্নতি। জগতে সকল দেশ অপেক্ষা এই দেশে উন্নতির গতি ক্ষিপ্রতর। আবার দেখ। আঙ্গল্ ও সাক্ষণেরা আসিয়া যখন শ্বেতদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন, তাঁহাদিগের নির্যাতনে আদিম নিবাসী ব্রিটনেরা উচ্ছিন্ন বা সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে অপসারিত হইল। আঙ্গল্ ও সাক্ষণেরা বৈষম্যবিষের সংক্রামণ হইতে রক্ষা পাইল। এই নবীন জাতি ক্রমেই উন্নতমার্গে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় আর একটী বলবত্তর জাতি আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইল। বিজয়ী নর্ম্মাণেরা আঙ্গলো-সাক্ষণদিগকে বিজিত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দাসরূপে পরিণত করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগকে অগত্যা সঞ্জীবনীশক্তিবিশিষ্ট উন্নতিশীল আঙ্গলোসাক্ষণ জাতির সহিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতায় মিশিয়া যাইতে হইল। আঙ্গলোসাক্ষণ

ও নর্ম্মান্ জাতির একরূপ একীভাব হইয়াছে যে, কখন যে তাঁহাদিগের মধ্যে বৈষম্য ছিল, একরূপ বোধ হয় না। এই একীভাবের পরিণাম ইংলণ্ডের বর্ত্তমান উন্নতি। এই সাম্যের বলে ইংলণ্ড ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের মধ্যে সিংহপ্রতিম। এই সাম্যের প্রসাদে ইংলণ্ড এতদূর বিজয়শীল।

আর সেই সাম্যের অভাবেই ভারতের আজ এই দুর্দ্দশা। আর্য্য-জাতি যে ঔদার্য্য দেখাইয়া বিজিত শূদ্রদিগকে সমূলে উৎসাদিত না করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, সেই ঔদার্য্যের বশীভূত হইয়া যদি তাহাদিগকে পূর্ণ সাম্য প্রদান করিতেন, তাহা হইলে আমরা আজ ভারতের অন্য মূর্ত্তি দেখিতাম। তাহা হইলে আমাদিগকে আজ ভারতবক্ষোপরি বৈদেশিক ধ্বজস্তম্ভ নিখাত ও ভারতগগনে বৈদেশিক পতাকা উড্ডীন দেখিতে হইত না। তাহা হইলে ইতিহাসও এই মর্ম্মন্তুদ বার্ত্তা বহন করিত না যে অল্পসংখ্যক যবন-সেনা ভারতপ্রদেশে আসিয়া অসংখ্য হিন্দুসেনাকে মোহান্ধ করিয়া ভারতসিংহাসন অধিকার করিল।

তদানীং বিজ্ঞাত জগতের অধীশ্বরী রোমনগরী প্রথমে সাম্যের মোহিনী শক্তি অনুভব করিতে পারেন নাই। এই জন্য পাট্রিসীয় ও প্লীবীয় এবং নাগরিক ও অনাগরিক এই দুই প্রকার বৈষম্যে তাঁহার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ জর্জ্জরিত ছিল। পাট্রিসীয় ও প্লীবীয়দিগের মধ্যে প্রথমে একরূপ বিদ্বেষভাব ছিল যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে ছাড়িতেন না। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ই প্রবল, সুতরাং পরস্পর কেহই কাহারও উচ্ছেদসাধন করিতে পারিলেন না। অবিরাম পরস্পর-সংঘর্ষে ক্রমে এই দুই সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ বৈষম্য অপনীত হইল। রোমের তেজঃপ্রতিভা অধিকতর প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আভ্যন্তরীণ বৈষম্য ঘুচিল বটে, কিন্তু বহিশ্চর বৈষম্যে রোম শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া রহিলেন। বিজিত ইতালীয় প্রদেশ-সকলকে রোম প্রথমে সমনাগরিকত্বের স্বত্ব প্রদান করেন নাই। সেই জন্য তখন বিজিত ইতালীয় প্রদেশ সকল সুবিধা পাইলেই রোমের প্রতিকূলে অভ্যুত্থিত

হইত। মহাবীর হানিবল্ যখন আল্পস্ পর্ব্বত উত্তরণ করিয়া ইতালীক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত ত্রিশ সহস্রমাত্র সৈন্য ছিল। তিনি সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই প্রবলপরাক্রান্ত রোমনগরীর অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার কি আশা ও কি সাহস ছিল? তিনি জানিতেন—রোম বিজিত ইতালীয় প্রদেশ সকলকে সমনাগরিকতা প্রদান করেন নাই। এই জন্য ইতালীয় প্রদেশ সকল মনে মনে রোমের বিরুদ্ধে চটিয়া আছে, তাঁহার সৈন্য উপস্থিত হইলেই তাহারা তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। হানিবলের সৈন্যসংখ্যা ইতালীক্ষেত্রে এত বাড়িয়া ছিল, যে কানিসমরে তিনি একলক্ষ রোমীয় সেনার সম্মুখীন হইয়া ইহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। রোম ইহার পর আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, ও ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইতালীয় প্রদেশকে সমনাগরিকত্ব প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমেই রোমের বলবীর্য্য বাড়িতে লাগিল। শেষে রোম পৃথ্বীশ্বরী হইয়া উঠিলেন।

বুদ্ধিদোষে ও প্রবৃত্তিবলে আর্য্যেরা কোন কালেই বৈষম্যের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। তাহার পরিণাম অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণ। আর্য্যদিগের অন্তর্বিপ্লবের অনেক পরিচয় সংস্কৃত-কাব্য পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। যখন ব্রাহ্মণেরা অতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের নির্যাতন আরম্ভ করিলেন, ব্রাহ্মণদিগের তাহা অসহ্য হইল। ব্রাহ্মবীর পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্ষত্রিয়রুধিরে পিতৃতর্পণ করিয়া তবে এ ক্রোধ শমিত করেন।

> ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
> সামন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হ্রদান্॥

সেই অবধি ক্ষত্রিয়সংখ্যা ভারতে এতদূর কমিয়া গিয়াছে যে ব্রাহ্মণ-সংখ্যার সহিত তুলনায় ইহা গণনীয়ের মধ্যেই নহে। ব্রাহ্মণদিগের বৈষম্যপ্রভাবের প্রধান অন্তরায়স্বরূপ ক্ষত্রিয়বর্গের ধ্বংসের

পর ব্রাহ্মণেরা আরও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। শূদ্রদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা শাস্ত্রকর্ত্তা, সুতরাং নূতন নূতন শাস্ত্র করিয়া শূদ্রের দাসত্ব-শৃঙ্খল আরও কসিতে লাগিলেন। ব্যবস্থা হইল, শূদ্রকে ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে; অথচ শূদ্র অস্পৃশ্য, শূদ্রের জল অব্যবহার্য্য। নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়; কোন উচ্চ সুখে তাহার অধিকার নাই; বেদাদি শাস্ত্রে তাহার অধিকার নাই, অথচ সেই শাস্ত্রের শাসনে তাহাকে চলিতে হইবে। তাহার ইহকাল ও পরকালের একমাত্র গতি ব্রাহ্মণ। তাহার যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান না করিলে, তাহার পরকালে গতি নাই, অথচ যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের দান গ্রহণ করিবেন, তিনি পতিত হইবেন। সুতরাং শূদ্র দান করিতে ইচ্ছুক হইলেও, তাহার পক্ষে গ্রহীতা ব্রাহ্মণ মিলা কঠিন হইত।

শূদ্রদিগের উপর প্রভুত্ব বাড়াইবার জন্য ব্রাহ্মণেরা—'ব্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণ' উপনিষদের উপর উপনিষদ, আরণ্যকের উপর আরণ্যক, সূত্রের উপর সূত্র, তার উপর ভাষ্য, তার টীকা, তার ভাষ্য—করিয়া অসংখ্য বৈদিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থে ভারতসাহিত্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শনাদি প্রকৃত বিদ্যার আলোচনা ভারত হইতে বিলুপ্ত হইল। শূদ্রদিগের জন্য যে শুদ্ধ কঠিন ধর্ম্মশাসন প্রতিষ্ঠাপিত হইল এরূপ নহে। তাহাদিগের উপর কঠোরতর দণ্ডবিধি সংস্থাপিত হইল। আমরা ভারতবাসীদিগের উপর ইংরাজদিগের পক্ষপাত ও অত্যাচার দেখিয়া কুপিত হই। কিন্তু ইংরাজদিগের প্রশংসায় আমাদিগকে অবশ্য বলিতে হইবে যে এ পক্ষপাত বা অত্যাচার ইংরাজদিগের দণ্ডবিধির দোষে নহে, ব্যবস্থাপক সভার মলীমসী লেখনীর ফল নহে, ইহা সেই দণ্ডবিধির প্রয়োগকর্ত্তা কতিপয় অজাতশ্মশ্রু উষ্ণশোণিত বিজয়দর্পী শ্বেতযুবকের প্রয়োগদোষ। ইংরাজদিগের দণ্ডবিধিতে শ্বেতকৃষ্ণ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই; ইহা ইংরাজদিগের ভারতশাসনের একটী প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ব্যবস্থাপক-সমাজ কর্ত্তৃক প্রণীত দণ্ডবিধি কিরূপ? ইহা আমূল পক্ষপাতদোষে দূষিত। মনুপ্রণীত দণ্ডবিধি

পাঠ করিতে করিতে আমাদিগেব মুখ লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়। আমাদেব পূর্ব্বপুরুষগণের অকীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা উপস্থিত হয়।

আবার সেই ভীষণ দণ্ডবিধিব প্রয়োগকর্ত্তা কে? প্রণেতা প্রয়োগকর্ত্তা নহেন। ব্রাহ্মণ দণ্ডবিধাতা হইলে, ইচ্ছা কবিলে দণ্ডের লাঘব বা মাপ করিতে পাবিতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ইচ্ছা হইলেও ব্রাহ্মণেব দণ্ডবিধিব অন্যথাকবণ করিতে পাবিতেন না। ব্রাহ্মণের গৃহে অকালমৃত্যু ঘটিল, ব্রাহ্মণ আসিয়া বাজদ্বাবে তারস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন "মহাবাজ। আপনার রাজ্যে নিশ্চয়ই কোন শূদ্র মুনিব্রত অবলম্বন কবিয়াছে, সেই পাপেই আমাব শিশু-সন্তানটী মরিয়াছে"। ব্রাহ্মণেব ক্রন্দনে বাজা স্থিব থাকিতে পারিলেন না। তিনি বন উপবন সমস্ত খুঁজিয়া দেখিলেন, এক নিবিড় বনে এক জন শূদ্র প্রগাঢ় তপস্যায় নিমগ্ন আছে। অমনি তাঁহাব শাণিত অসি সেই শূদ্র তপোধনেব মস্তক দ্বিধা বিচ্ছিন্ন কবিল। শূদ্রের মস্তক ত এইরূপে কথায় কথায় কাটা পড়িত; কিন্তু ব্রাহ্মণেব কেশ স্পর্শ কবে, কাহাব সাধ্য? ব্রাহ্মণ কোন অপরাধেই শীর্ষচ্ছেদ্য নহেন। ব্রাহ্মণ স্ত্রীহত্যা, নবহত্যা, শিশুহত্যা প্রভৃতি যাহাই করুন্ না কেন, নির্ব্বাসন তাঁহাব চরম দণ্ড।

এই ত গেল বাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক শাসন। সামাজিক শাসন ইহা অপেক্ষা কোন মতে ন্যূন নহে। ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণে বিবাহ কবিতে পাবিবেন; ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণেতব বর্ণত্রয়ে বিবাহ কবিতে পাবিবেন; বৈশ্য নিম্নতব দ্বিবর্ণে বিবাহ করিতে পারিবেন; কিন্তু শূদ্রকে কেবল নিজ বর্ণ হইতেই ভার্য্যা মনোনীত কবিতে হইবে। শূদ্র ব্রাহ্মণকন্যাতে অভিগমন করিলে শীর্ষচ্ছেদ্য হইবে, এবং তাহাদিগেব সঙ্গমের ফলস্বরূপ অপত্য অস্পৃশ্য শূদ্র অপেক্ষাও ঘৃণিত চণ্ডাল হইবে। শূদ্র অস্পৃশ্য বটে, কিন্তু চণ্ডালের আবাব ছায়াপর্য্যন্তও অস্পৃশ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য—শূদ্রকন্যাতে অভিগমন কবিলে তাঁহারা যে কেবল দণ্ড হইতেই নিষ্কৃতি পাই-

বেন এরূপ নহে, তাঁহাদিগের সঙ্গমেব ফলস্বরূপ অপত্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হইবে। ব্রাহ্মণের অন্নজল সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু তিনি কাহাবও অন্নজল গ্রহণ কবিবেন না। শূদ্রেব অন্নজল গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভক্ষণে শূদ্রের ঐহিক বিশুদ্ধি ও পাবলৌকিক মুক্তি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে এই বর্ণগত বৈষম্য বর্ত্তমান ভাবতে বিদ্যমান আছে কি না। ইংবাজ শাসনেব অধীনে বর্ণগত বজনৈতিক বৈষম্য অপনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক বৈষম্য প্রবলতব রূপে বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে অনুলোম বিবাহ থাকায নিম্নবর্ণস্থ কন্যাব উচ্চ বর্ণেব স্বামী লাভেব আশা ছিল, কিন্তু এক্ষণে উচ্চবর্ণেব পুরুষ নিম্নবর্ণেব কন্যাকে বিবাহ কবিলে সমাজচ্যুত হইবেন। অন্নগ্রহণ সম্বন্ধেও সেইরূপ কঠোবতা অদ্যাপি বর্ত্তমান। ধর্ম্মশাসনও সেইরূপ কঠোব বহিযাছে। সেই যাগযজ্ঞ, সেই মন্ত্র, সেই দানধ্যান, সেই দক্ষিণা, সেই প্রাযশ্চিত্ত। আমবা পবিবাব-বিশেষেব কথা বলিতেছি না, কিন্তু ভাবতবর্ষীয় হিন্দুজাতি-সাধাবণেব কথা বলিতেছি। ব্রাহ্মণেবা এইরূপে অন্য বর্ণকে আপনাদিগেব কূট উপধর্ম্মজালে আচ্ছন্ন কবিতে গিয়া আপনাবাও তাহাতে আবদ্ধ হইযা পড়িযাছেন। যাঁহাবা প্রথমে যাগযজ্ঞেব ব্যবস্থা ও মন্ত্রেব সৃষ্টি কবিয়াছিলেন, তাঁহাবা যাগযজ্ঞেব উপকাবিতা বা মন্ত্রেব শক্তি বিশ্বাস কবিতেন এরূপ বোধ হয় না। সূক্ষ্মদর্শী চার্ব্বাক সত্যই বলিয়াছেন যে ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেবা দক্ষিণাদির লোভেই যাগ যজ্ঞাদির ব্যবস্থা কবিযাছেন। বস্তুতঃ আদি ব্রাহ্মণেবা যেরূপ বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাহাতে কোন প্রকাব উপধর্ম্মে তাঁহাদিগেব যে বিশ্বাস থাকিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না। হীন বর্ণের মূর্খতাব সুবিধা লওয়াই তাঁহাদিগেব উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু হীনবর্ণেব সর্ব্বনাশেব জন্য তাঁহাবা যে উপধর্ম্মেব সৃষ্টি কবিলেন, কালে তাঁহাদিগেব বংশধবগণ সেই উপধর্ম্ম-জালে জড়িত হইলেন। তাঁহাদিগেব বংশধবগণ তাঁহাদিগেব অন্তর্নিহিত গূঢ় অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া, স্বার্থসাধনোদ্দেশে পিতৃগণ-প্রবর্ত্তিত সেই উপ-

ধর্ম্মকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিলেন। অন্যান্য বর্ণের ন্যায় তাঁহারাও সেই উপধর্ম্মের ঘোরতর গোঁড়া হইয়া উঠিলেন, অন্ধ বিশ্বাসে ও পূর্ব্বপুরুষগণের অন্ধ অনুসরণে ক্রমে তাঁহাদিগের বুদ্ধি ভ্রংশ হইতে লাগিল। কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কোন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে না। যুক্তিহীন সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই ধর্ম্মহানি হয়,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণযঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজাযতে॥

দেবগুরু পণ্ডিতশিরোমণি সূক্ষ্মবুদ্ধি বৃহস্পতির এই অমূল্য উপদেশ তাঁহারা ক্রমেই ভুলিয়া গেলেন। কালে বৃহস্পতির বংশধরেরা গণ্ডমূর্খ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ঘোর অজ্ঞানতিমির সমস্ত ভারত আচ্ছন্ন করিল। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা এই জন্য তদ্রুৎপীড়িত শূদ্র জাতি অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয়। ইহাঁরা পাণ্ডিত্যাভিমানী, অথচ চূড়ান্ত মূর্খ। ইহাঁদের পাণ্ডিত্য শাস্ত্রের গথ মুখস্থ রাখায়, অথচ ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকে সে শাস্ত্র কখন চক্ষে দেখেন নাই। যে দেব ভাষায় সে শাস্ত্র রচিত, অনেকে সে দেবভাষার বর্ণমালা পর্য্যন্তও কখন নয়নগোচর করেন নাই। যাঁহাদিগের সে ভাষায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎ-পত্তি জন্মিয়াছে, এবং সে শাস্ত্রেও কিঞ্চিৎ প্রবেশ লাভ হইয়াছে, তাঁহা-দিগেরও শব্দজ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান নাই। শাস্ত্রকারেরা কি উদ্দেশে সেই সকল শাস্ত্র করিয়াছেন, সে সকল শাস্ত্র সঙ্গত কি না, এখনকার কালের উপযোগী কি না, এ সকল বিচার করিবার শক্তি তাঁহাদিগের নাই। শূদ্রেরা, দেখিবার অধিকার নাই বলিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া ব্রাহ্মণেরা যে দিকে যাইতে বলিয়াছেন, সেই দিকেই যাইতেছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পিতৃপুরুষগণ খানায় পড়িতে বলিয়াছেন বলিয়া উন্মী-লিত নয়নে খানায় গিয়া পড়িতেছেন।

এই বর্ণ-বৈষম্য এক্ষণে এত বাড়িয়াছে যে ভাবিতে গেলে ভয় হয়। খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টানকে দেখিলে ও মুসলমানের মুসলমানকে দেখিলে যেরূপ আনন্দ হয়, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকে ও শূদ্রের শূদ্রকে দেখিলে সেরূপ আনন্দ

হয় না। বঙ্গে ব্রাহ্মণ—রাঢী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী প্রভৃতি কয় প্রধান ভাগে বিভক্ত। সেই কয় প্রধান ভাগের ভিতর আবার কুলীন, ভঙ্গকুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ প্রভৃতি এত অবান্তরভেদ জন্মিয়াছে যে, সে সকলের সংখ্যা করা সহজ নহে। এক একটী ভাগ এক একটী স্বতন্ত্র জাতি। এক একটি অবান্তরভাগ এক একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। রাঢী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী ইহাঁরা পরস্পরের সহিত আদান প্রদান বা পরস্পরের অন্নগ্রহণ করেন না। কুলীন বিনা দক্ষিণায় ভঙ্গকুলীন বা বংশজের অন্ন গ্রহণ করিবেন না, বিপুল অর্থ বিনা তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিবেন না। শ্রোত্রিয়, বংশজ বা ভঙ্গকুলীন অর্থব্যয়েও সহজে কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না। যদি কোন কুলীন দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তদীয় কন্যাকে বংশজের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি সবংশে কৌলীন্যচ্যুত হইবেন। এতদ্ভিন্নও শূদ্রযাজনা ও যাবনিক সংস্রবে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পীরআলি ও গোব্রাহ্মণাদি অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ জন্মিয়াছে। ইহাঁদিগের পরস্পরের ভিতর হিন্দু মুসলমান পার্থক্য বর্ত্তমান। এতদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদিগের ভিতরও অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রস্তাববাহুল্যভয়ে সে সকলের উল্লেখ হইতে বিরত থাকিতে হইল। আবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এত প্রাদেশিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছে যে, এক জন কাশ্মীরী বা পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ প্রাণান্তেও কখন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে কন্যাদান বা তাঁহার অন্নগ্রহণ করিবেন না। এইটী রূপে দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, ভোজপুরী, কনোজী, বাঙ্গালী, উড়িয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁরা পরস্পরকে বিধর্ম্মীর ন্যায় ঘৃণা করেন। এই গৃহ-বিচ্ছেদ হইতেই ব্রাহ্মণদিগের বর্ণপ্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে। যে স্বশ্রেণীহিতৈষিতা শক্তি প্রভাবে ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে চতুর্ব্বর্ণের উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যে স্বশ্রেণীহিতৈষিতা বলে ইহাঁরা দিগন্তব্যাপী প্রবল-প্রতাপ বৌদ্ধধর্ম্মেরও মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সেই স্বশ্রেণীহিতৈষিতা এক্ষণে সঙ্কীর্ণতম সীমায় আবদ্ধ হইয়াছে।

এক্ষণে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ সংখ্যায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বর্ণের সহিত তুলনায় নগণ্য মাত্র; সুতরাং তাঁহাদিগের বিষয় লইয়া সবিশেষ আন্দোলন অনাবশ্যক। তবে ইহাঁরাও বর্ণ-বৈষম্য দোষে উৎপীড়িত ও উৎপীড়ক। ক্ষত্রিয়দিগকে আজও সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুতা স্বীকার করিতে হয়। রাজ্যশাসন ভার তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পিত ছিল বলিয়া পূর্ব্বে তাঁহাদিগের এ দাসত্ব তত ক্লেশকর বোধ হইত না। এক্ষণে তাঁহারা পূর্ব্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তথাপি পূর্ব্ব দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের এক সান্ত্বনা-স্থল আছে। তাঁহারা এখনও বৈশ্য ও শূদ্রের উপর আধিপত্য করিতেছেন। তাঁহারা যেমন পদদলিত হইতেছেন, তেমনই পদদলিত করিতেছেন।

বৈশ্যদিগের অবস্থা ক্ষত্রিয়দিগের অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। বঙ্গের সুবর্ণবণিকদিগের সামাজিক অবস্থা এত দিন শূদ্রদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিল। আজ কাল মাত্র ইহাঁরা বৈশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। এত দিন ইহাঁরা অন্ততঃ মততঃ অস্পৃশ্য-চণ্ডাল-সম ছিলেন। লক্ষ্মীর বরপুত্র বলিয়া ইহাঁরা ব্রাহ্মণদিগের কৃপার পাত্র ছিলেন মাত্র। অন্যান্য প্রদেশের বৈশ্যদিগেরও সামাজিক অবস্থা সম্পূর্ণ সুখপ্রদ নহে।

আমরা এক্ষণে হিন্দুসমাজের প্রাণভূত অথচ অত্যন্ত অবহেলিত শেষ শাখায় উপনীত হইলাম। আমরা শূদ্রবর্ণকে হিন্দুসমাজের প্রাণভূত বলিলাম; কারণ শূদ্রেরা সংখ্যায় আর্য্য বর্ণত্রয় অপেক্ষা অনেক অধিক। বিজিত ও বিজয়ী জাতির মধ্যে এরূপ সংখ্যাবৈলক্ষণ্য ঘটিবেই ঘটিবে। যদি ইংরাজেরা কখন ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া ভারতবাসীদিগের সহিত মিশিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বা তাঁহাদিগের ভবিষ্য বংশধরগণের সংখ্যা ভারতের বিজিত অধিবাসিদিগের সংখ্যা অপেক্ষা চিরকালই ন্যূন থাকিবে।

এই শূদ্রদিগের মধ্যে আবার এত সাম্প্রদায়িকতা জন্মিয়াছে, যে এক একটী সম্প্রদায়কে এক একটী স্বতন্ত্র বর্ণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উচ্চশ্রেণীর শূদ্র ও নিম্নশ্রেণীর শূদ্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র পার্থক্য বর্ত্তমান। আর্য্য ও অনার্য্য বর্ণ সংমিশ্রণে যে সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদিগের অবস্থা বিজিত শূদ্রগণের অপেক্ষা বড় অধিক ভাল নহে। সঙ্করবর্ণে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হইতেছে বটে, তথাপি ইহাঁরা আর্য্যবর্ণত্রয়ের অনৌদার্য্য বশতঃ উক্ত বর্ণত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহাদিগকে অগত্যা শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর্য্যজাতির পরস্পর মিশ্রণে যে সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদিগের সামাজিক অবস্থা পূর্ব্বোক্ত বর্ণসঙ্করের অবস্থা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। যাহা হউক সঙ্করবর্ণ, সৎশূদ্র, অন্ত্যজ শূদ্র ও তাহাদিগের শাখা প্রশাখা লইয়া শূদ্রবর্ণ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান বা অন্নগ্রহণাদি প্রচলিত নাই।

এই রূপে হিন্দুসমাজ অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পরস্পর মমতা-শূন্য বিচ্ছিন্নাঙ্গ ও জাতীয়-ভাব-বিরহিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জেতার হস্তে পতিত হইতেছে। মোগল, পাঠান, তুর্কী, দিনেমার,—পর্টুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাশি, ইংরাজ—ক্রমেই এই বিকলাঙ্গ অন্তর্ব্বিচ্ছিন্ন ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যত দিন এক অঙ্গে বেদনা লাগিলে অন্যান্য অঙ্গে তাড়িত বেগে সমবেদনা উপস্থিত না হইবে, যত দিন বর্ণমধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ উঠিয়া না যাইবে, তত দিন হিন্দুজাতির বৈদেশিক অধীনতা হইতে রক্ষা নাই। ইংরাজ যায় রুষ আসিবে, রুষ যায় জার্ম্মান্ আসিবে, জার্ম্মান্ যায় ফরাশি আসিবে। এই রূপে অনন্ত বিজয়-প্লাবনে ভারত-বক্ষ আপ্লুত হইবে।

ভারতের অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ ধর্ম্ম-বৈষম্য। যখন আর্য্যজাতি ইরিণ বা ঈরাণ দেশ হইতে আসিয়া প্রথমে ভারত বিজয় করেন, তখন উহাঁরা বুদ্ধিবলে দেখিতে পান যে বিজিতদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিলে তাহাদিগের উপর চিরকাল আধিপত্য করিতে পারিবেন না। বিজিতদিগকে স্বধর্ম্মে আনিয়াছিলেন বলিয়াই রাজনৈতিক প্রভুতার বিলোপেও বিজিত শূদ্রগণের

উপর ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মনৈতিক প্রভুতা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই ধর্ম্মনৈতিক একীভাবের নিমিত্তই আর্য্য ও অনার্য্যে জেতা ও বিজিত ভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কখন যে আর্য্যেরা শূদ্রদিগকে বিজিত করিয়াছিলেন এ ঐতিহাসিক স্মৃতি পর্য্যন্তও শূদ্রসাধারণের মন হইতে তিরোহিত হইয়াছে। অশিক্ষিত শূদ্রেরা আজও বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না যে তাহাদিগের এ দুর্গতির প্রধান কারণ আর্য্য ব্রাহ্মণ। তাহারা জানে ব্রাহ্মণ তাহাদিগের পারত্রিক মুক্তিদাতা। তাহাদিগের পারত্রিক মুক্তিদাতা ব্রাহ্মণ কখন তাহাদিগের ঐহিক সুখের হন্তা হইতে পারেন শূদ্রসাধারণ ইহা মনে করিতেও পাপ মনে করে। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের এই সূক্ষ্মদর্শনের ফল আরও কত দিন ভোগ করিবেন তাহারও ইয়ত্তা নাই।

ভারতে আর্য্যদিগের ন্যায় আর কোন বিজেত্রী জাতি বিজিতদিগকে আমূল স্বধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। এই জন্য মুসলমান রাজত্বকাল দীর্ঘ কাল ভারতে স্থায়ী হয় নাই। মুসলমানেরা আংশিক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগের রাজত্ব সহস্রবর্ষব্যাপী হইয়াছিল। মোগল রাজবংশ হিন্দুজাতির প্রতি ধর্ম্মনৈতিক উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি এত উজ্জ্বল বিভা ধারণ করিয়াছিল।

নব্য ভারত ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে এক্ষণে জাতীয় জীবন উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মনৈতিক একতা ভিন্ন জাতীয় জীবন অঙ্গহীন। আমি যতই কেন উদার হই না, মুসলমান খ্রীষ্টীয়ান্ যিহুদীকে একটু দূরে রাখিব। সেইরূপ খ্রীষ্টিয়ান্ মুসলমান যিহুদী যতই উদার হউন না, বিধর্ম্মী বা পুত্তলিকোপাসক বলিয়া হিন্দু তাঁহার ঘৃণার পাত্র বা শোচ্য। অন্নজলাদিগ্রহণ ও অন্নদানপ্রদান ব্যতীত কখনই সমসামাজিকতা জন্মে না। সমসামাজিকতা ব্যতীতও জাতীয় জীবন দৃঢ় হয় না। ধর্ম্মনৈতিক একতা ব্যতীতও এই সম-সামাজিকতা কখনই সম্ভবে না; সুতরাং ভারতের জাতীয় একতা বন্ধনের জন্য ধর্ম্মনৈতিক একতা একান্ত প্রার্থনীয়।

ভারতের অধঃপতনের তৃতীয় কারণ জাতিবৈষম্য। এ জাতিবৈষম্য জেতৃ-বিজিত-জাতিবৈষম্য বা বর্ণবৈষম্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ইহা ভৌগোলিক বা প্রাদেশিক জাতীয়তা। প্রদেশভেদে ভারতবাসিগণের পরস্পরের প্রতি জাতীয় বিদ্বেষ ইহার প্রতিপাদ্য। এই ভৌগোলিক সাম্প্রদায়িকতা বহু কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখনই এই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি। তখন ইহা অনিবার্য্য ও কতকটা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; কালক্রমে এই অনিবার্য্য ও প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক বিভাগ অতি ঘোরতর জাতীয় ভাবে পরিণত হইল। এক আর্য্য জাতি, ও এক অনার্য্য জাতি এই সকল বিভিন্ন বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ হইয়া ক্রমে আপনাদিগের প্রকাণ্ড জাতীয় ভাব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রী বা পঞ্জাবী প্রভৃতি আর্য্য বাঙ্গালী উড়িয়া প্রভৃতি আর্য্যকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বিভিন্নদেশীয় অনার্য্যদিগের মধ্যেও এইরূপ বিজাতীয় ভাব। এই প্রাদেশিক জাতীয় ভাব ক্রমে জাতীয় শত্রুতায় পরিণত হইল। এই প্রাদেশিক জাতীয় শত্রুতা হইতেই আর্য্যজাতির যবন-হস্তে পতন হয়। এই শত্রুতা থাকিতে আমাদিগের ভারতীয় জাতীয় মাহাত্ম্য কখনই হইবে না। রোমীয় রাজ-তন্ত্রের সময় ইতালীতে এই প্রাদেশিক জাতীয় বিদ্বেষ ছিল, এই জন্য তখন রোমের তেজঃপ্রতিভা তত দূর বিকাশ পায় নাই। রোমীয় সাধারণতন্ত্রের সময় এই প্রাদেশিক জাতীয় বিদ্বেষ বিলুপ্ত হয়, এই জন্য এই সময়ে রোমের এত প্রতাপ, এত মাহাত্ম্য। রোমীয় সাম্রাজ্যের সময়ও এরূপ প্রাদেশিকতা ছিল না, রোমীয় সাম্রাজ্যেরও গৌরবের ইয়ত্তা ছিল না। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর আবার ইতালী এই প্রাদেশিক জাতীয় সাম্প্রদায়িকতায় ছিন্ন ভিন্ন হইল। তাহার পরিণাম বৈদেশিক অধীনতা। ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দকে এই প্রাদেশিক জাতীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসংখ্য লেখনী সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। সেই মহতী উদ্দীপনা শক্তি প্রভাবে ইতালীয় প্রদেশ সকল যখন আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন

তাঁহারা পীডমণ্টরাজ ভিক্টর ইমানুয়েলের অধীনে একটী সমবেত ইতালীয় জাতিরূপে পরিণত হইলেন। অমনি তাঁহাদিগের পায়ের শৃঙ্খল খুলিল। গ্যারীবল্ডী সমবেত ইতালীয় সেনা লইয়া বিজয়ী অষ্ট্রিয়দিগকে বিজিত করিয়া তুষরাশির ন্যায় তাহাদিগকে ইতালী-ক্ষেত্র হইতে উড়াইয়া দিলেন। এইরূপ যখন জার্ম্মানী কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখন ফ্রান্সের পদাঘাতে মধ্যে মধ্যে জার্ম্মান্‌দিগের মস্তক চূর্ণীকৃত হইত। প্রথম নেপোলিয়নের সময় তাঁহাদিগের দুর্গতির আর পরিসীমা ছিল না। তৃতীয় নেপোলিয়নেরও ভয়ে জার্ম্মানেরা কম্পিত হইতেন। স্বদেশহিতৈষী বিস্‌মার্ক তাঁহাদিগের জাতীয় অবনতির কারণ বুঝিলেন। জাতীয় একতা সম্পাদনে তিনি প্রাণপণ করিলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় বিচ্ছিন্ন জার্ম্মান্ প্রদেশ সকল প্রুসিয়ার রাজার অধীনে একটী প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত হইল। সমবেত জার্ম্মান্ সাম্রাজ্যের প্রতাপ অচির কাল মধ্যে বিজয়ী ফ্রান্সে অনুভূত হইল। সিডান্ রণক্ষেত্রে যবাশি-সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন সমবেত জার্ম্মান্ সেনার পদানত হইলেন। অবরুদ্ধ পারিস ছয় মাস আত্মরক্ষার পর বিজয়ী জার্ম্মান্ সেনার নিকট আপনার দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন, এবং সুবর্ণরাশির বিনিময়ে অবরুদ্ধ ফরাসিগণ প্রাণ ভিক্ষা পাইলেন। ইতিহাস এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ, কিন্তু আর নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সকলেই বুঝিবেন যে এই প্রাদেশিক জাতীয় সাম্প্রদায়িকতার পরিহার ব্যতীত ভারতের জাতীয় একতা-বন্ধনের কোন আশা নাই। এই প্রাদেশিক জাতীয় ভাবের নিবারণের তিনটী প্রধান অন্তরায় আছে। পরিচ্ছদ-বৈষম্য, ভাষাবৈষম্য ও শাসনবৈষম্য। সুতরাং এ তিনটী বৈষম্যকেই আমরা ভারতের অধঃপতনের কারণ বলিয়া ধরিব।

ভারতের অধঃপতনের চতুর্থ কারণ **পরিচ্ছদবৈষম্য**। পরিচ্ছদের একতা ভিন্ন কখন মমত্বজ্ঞান হয় না। এক জন সাহেব যদি আমাদের পরমহিতৈষী হন, তথাপি তাঁহাকে দেখিলেই কেমন পর পর বলিয়া বোধ হইবে। এক জন বাঙ্গালী যদি আমার পরম শত্রু হয়, তথাপি

তাহাকে দেখিলেই, যেন কেমন আপন আপন বলিয়া বোধ হইবে। এই পরিচ্ছদসাম্যপ্রিয়তা হইতেই আমরা এক জন দেশীয়কে বৈদেশিক পরিচ্ছদে আবৃত দেখিলে সহিতে পারি না। পরিচ্ছদসাম্য জাতীয় জীবনের প্রথম লক্ষণ; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ভারতের ন্যায় পরিচ্ছদ-বৈষম্য আর কোন দেশে দেখা যায় না। সমস্ত ইউরোপে প্রায় একই রকম পরিচ্ছদ, কিন্তু এক ভারতে অসংখ্য বিভিন্ন পরিচ্ছদ। এক জন ভারতবাসী বিদেশে যাউন, তাঁহাকে ভারতবাসী বলিয়া চিনিবার কোন লক্ষণ নাই। তাঁহাকে বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, কি মহারাষ্ট্রী বলিয়া চিনিতে হইবে। গুরুগোবিন্দ পরিচ্ছদ-সাম্যের মোহিনী শক্তি বুঝিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি খালসা মাত্রকেই এক বর্ণের এক রকম পরিচ্ছদে আবৃত করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারতবাসী যদি একটী প্রকাণ্ড জাতীয় জীবনের প্রার্থী হন, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগকে জাতীয় জীবনের প্রথম লক্ষণ পরিচ্ছদ-সাম্য অবলম্বন করিতে হইবে।

৫। ভারতের অধঃপতনের পঞ্চম কারণ ভাষা বৈষম্য। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা কথনশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে কখন জাতীয় সহানুভূতি হইতে পারে না। ইংরাজ কখন ফরাশিকে এক জাতি বলিয়া মনে করিতে পারেন না, সেইরূপ বাঙ্গালী কখন মহারাষ্ট্রীকে এক জাতি বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। মহারাষ্ট্রীয়ও বঙ্গে আসিয়া একটী বিভিন্ন জাতির সহিত মিলিত হইয়াছি বলিয়া মনে করিবেন। ভাষাবৈষম্য নিমিত্তই বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে কখনই জাতীয় সহানুভূতি জন্মে নাই। এই জন্যই আমাদিগকে বর্গীর হঙ্গাম পোহাইতে হইয়াছিল। আবার যদি মহারাষ্ট্র-প্রতাপ কখন পুনরুদিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে হয় ত সেই হঙ্গাম আবার পোহাইতে হইবে। এইরূপ তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, গুজরাটী, ভোজপুরী, মাড়ওয়ারী, পঞ্জাবী, গুরুমুখী, হিন্দি, উর্দ্দু, পার্শী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী, ইংরাজী প্রভৃতি অসংখ্য ভাষা যে দেশে প্রচলিত সে দেশের জাতীয় একতা বড় সহজ ব্যাপার নহে। প্রত্যেক-ভাষাকথনশীল জাতির স্বতন্ত্র জাত্যভিমান আপনিই হইয়া পড়ে। এই সাম্প্রদায়িক জাত্যভিমান হইতে পরস্পর বিদ্বেষ

অতিশয় বাড়িয়া উঠে। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজ রাজনীতির কৌশলে এই ভাষাগত ভেদ দিন দিন আরও বাড়িতেছে। যে সকল প্রাদেশিক ভাষা এখনও পুষ্টাবয়ব হয় নাই, অথচ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে কোন প্রধান ভাষার সহিত তাহার অনেক ঐক্য আছে, তখন অপুষ্ট ভাষাকে অঙ্কুরে বিদলিত করিয়া সেই পুষ্ট মূল ভাষাকে তৎস্থানে সন্নিবেশিত করাই জাতীয় হিতাকাঙ্ক্ষী গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ স্থলে আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিপরীত নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এইরূপ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি (Decentralization policy)) আর কিছু দিন চলিলে ভারত অচির কাল মধ্যে অসংখ্য বিভিন্নভাষাবলম্বী জাতিতে পরিণত হইবে। ভাষাসংখ্যা যত বাড়িতে থাকিবে, ততই ভারতের একীকরণ কার্য্য সুদূর-পরাহত হইবে। এই রূপে প্রাদেশিক বিদ্বেষানল যতই প্রজ্বলিত হইবে, ততই বৈদেশিক শৃঙ্খল কঠিনতর হইয়া আসিবে। ভাষাবৈষম্যে যে কেবল প্রাদেশিক বিদ্বেষানল অধিকতর প্রজ্বলিত হয় এরূপ নহে, ইহাতে এক প্রদেশের উন্নতিতে প্রদেশান্তরের উন্নতি হয় না। তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্থল বঙ্গভাষা। বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তির অধিকতর পরিমার্জ্জনার সহিত বাঙ্গালীর ভাষাও অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও পুষ্টাবয়ব হইতেছে। ইহার সহিত তুলনায় ভারতীয় অন্যান্য ভাষা দিন দিন অধিকতর হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে। যদি বাঙ্গালা ভাষা সমস্ত ভারতবাসীর ভাষা হইত, তাহা হইলে আজ ভারতের কি সৌভাগ্য হইত! কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আশা করিতেছি না যে সমস্ত ভারতবাসীই বঙ্গভাষাকে ভারতীয় জাতীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিবেন। প্রার্থনীয় হইলেও সে আশা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। যাহা হউক যে ভাষাই ভারতীয় জাতির ভাষা হউক না কেন, ইহা স্থির যে এরূপ একটী জাতীয় সাধারণ ভাষা ব্যতীত ভারতের সমীকরণ অসম্ভব। যাঁহারা ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে মাতাইয়া ভারত মাতাইলাম বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত অন্ধ, কারণ বৈদেশিক ভাষায় কখন একটী জাতিকে মাতান যাইতে পারে না। বৈদেশিক ভাষা সমাজের

অধস্তল স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য বৈদেশিক ভাষায় বক্তৃতাদি সমাজের অধস্তলকে উদ্দীপিত করিতে পারে না। ইহা উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর কয়েক জন মাত্রকে চালিত করিয়া থাকে। সে কয়েক জন অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয়। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে টাউনহল প্রভৃতিতে যে সকল সভা হয়, তাহাতে কতিপয় অজাতশ্মশ্রু যুবক ব্যতীত জাতিসাধারণ সমবেত হন না। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রকাশ্য সভা সকলে যে অসংখ্য লোক সমবেত হয়, উহার প্রধান কারণ স্বদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা। স্বদেশীয় ভাষার উদ্দীপনা-শক্তি অতি চমৎকার! ইহা মৃতদেহেও জীবন সঞ্চার করে, নির্ব্বাণ-প্রায় বীর্য্যবহ্নিকে সন্ধুক্ষিত করে, তথাপি যাঁহারা বলিবেন যে ইংরাজী ভারতের জাতীয় ভাষা হইবেক, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহা-দিগের মতের পরিপোষক কোন পূর্ব্ব নিদর্শন আছে কি না? আমরা ত ইতিহাসে ইহার অনুরূপ একটী দৃষ্টান্তও পাই না। রোম ত অসংখ্য রাজ্যকে পরাজিত করিয়া নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু রোমীয় ভাষা কোন্ বিজিত দেশের মাতৃভাষাকে তাড়িত করিয়া তৎ-স্থান অধিকার করিয়াছিল? বিজিত দেশ সকলের ভাষানিচয় রোমীয় ভাষা দ্বারা কেবল মার্জ্জিত ও পুষ্টাবয়ব হইয়াছিল মাত্র। এইরূপ নর্ম্মান্ জাতি যখন আঙ্গ্‌লোসাক্সনদিগকে বিজিত করিয়া ইংলণ্ডে নর্ম্মান্ জাতির আধিপত্য স্থাপন করিলেন, তখন আইন আদা-লত সব ফ্রাঙ্কো-নর্ম্মান্ ভাষায় চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু আঙ্গ্‌লো-সাক্সন ভাষাই ইংলণ্ডের মাতৃভাষা রহিয়া গেল, কেবল বিজেত্রী জাতির ভাষা দ্বারা পুষ্টাবয়ব হইল মাত্র। আমরা ঘরের মধ্যেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। যে আর্য্যজাতি প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, যাঁহারা বিজিত অনার্য্যজাতির সহিত অনেক বিষয়েই একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনার্য্য ভাষাকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দেবভাষাসম অনুপম সংস্কৃত ভাষাকে ভারতীয় জাতীয় ভাষা করিতে পারেন নাই, দেশীয় বা প্রাকৃত ভাষাই জাতীয় ভাষা রহিল, কেবল সংস্কৃতের সহিত সংমিশ্রণে সংঘর্ষণে পরিপুষ্ট ও

অধিকতর সুললিত হইল মাত্র। আর্য্যেরা বিজিত জাতির ভাষাকে যে শুদ্ধ বিদূরিত করিতে পারিলেন না এরূপ নহে, তাঁহারা সেই প্রাকৃত ভাষাকে আদর করিয়া সংস্কৃত নাটকাদিতে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সেইরূপ মুসলমানেরা ভারতে সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াও পারস্যভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা করিতে পারেন নাই। প্রতি গৃহে পারস্য ভাষার চর্চ্চা, প্রতি আদালত ও প্রতি বিদ্যালয়ে পারস্য-ভাষার আলোচনা; তথাপি পারস্যভাষা কিছুতেই ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইল না। শেষে একটা সামঞ্জস্য হইল। পারস্য ভাষার সংমিশ্রণে জাতীয় ভাষা হিন্দি কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া হিন্দু মুসলমান উভয়ের উপযোগী একটী মিশ্র ভাষা রূপে পরিণত হইল। বলা বাহুল্য যে এই ভাষার নাম উর্দ্দু। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে আর্য্যজাতি বা মুসলমান জাতি ইংরাজদিগের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে ভারতে রাজ্য করেন নাই। তাঁহারা ভারতের অধিবাসী হইয়া ভারতের শাসন করিয়াছিলেন, সুতরাং ভারতের বিজিত অধিবাসিদিগের সহিত তাঁহাদিগের অনেক পারিবারিক ও সামাজিক সংমিশ্রণ হইয়াছিল; তথাপি তাঁহারা আপনাপন ভাষা দ্বারা দেশীয় ভাষাকে বিদূরিত করিতে পারেন নাই। ইংরাজেরা আমাদিগের সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তাঁহাদিগের সহিত আমাদের আফিস আদালত ও বিদ্যালয়াদিতে যাহা দেখা শুনা হয়। তবে তাঁহাদিগের ভাষা আমাদিগের (Lingua Franca) জাতীয় ভাষা হইবে কিরূপে? তবে এক উপায় আছে। ইংরাজেরা যদি এরূপ আইন জারী করেন যে—আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভারতে যে কেহ ইংরাজী ভিন্ন আর যে কোন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবে, তাহাকে দণ্ড-বিধির কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে; তাহা হইলে,এক দিন ইংরাজী আমাদের জাতীয় ভাষা হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ইংরাজেরা এরূপ অস্বাভাবিক আইন জারী করিতে সক্ষম হইলেও করিবেন না; কারণ এরূপ আইন জারী করা যত সহজ, এরূপ আইন কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। রুসিয়া যে পোলণ্ডস্থলে এরূপ অসাধ্যসাধনে কৃত-কার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার কারণ বিজিতদিগের সংখ্যার অল্পতা;

কিন্তু বিজিত ভারতবাসিগণের সহিত তুলনায় বিজয়ী ইংরাজ কয় জন ? সমস্ত ভারতবাসী ইংরাজী গ্রহণে প্রস্তুত হইলেও পঞ্চবিংশকোটী ভারত-বাসীকে ইংরাজী শিখায় এরূপ লোক কই ?

ভারতের জাতীয় অধঃপতনের ষষ্ঠ কারণ **শাসনবৈষম্য**। ভারত প্রকৃত প্রস্তাবে কখনই এক শাসনের অধীন হয় নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখা যায় যে ভারত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সতত সংবিভক্ত। আর্য্যদিগের ভারতবিজয়ের পূর্ব্বেও ভারতের এই দশা ছিল। এই জন্যই অতি অল্পসংখ্যক আর্য্য যোদ্ধা সেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শূদ্ররাজ্যকে এক একটী করিয়া পরাস্ত করিয়া প্রথমে সমস্ত আর্য্যা-বর্ত্তে, পরে সমস্ত ভারতে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন, কিন্তু ভারত-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পর আর্য্যেরাও বিজিত অনার্য্যদিগের ভ্রমে পতিত হইলেন। ইহাঁরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সংবিভক্ত হইয়া ভারত শাসন করিতে লাগিলেন। এক এক জন রাজচক্রবর্ত্তী এই সকল ক্ষুদ্র রাজমণ্ডলীর অধিনেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইতেন বটে, কিন্তু সে অধিনেতৃত্ব নাম মাত্র। আভ্যন্ত-রীণ ও বহিশ্চর সকল বিষয়েই তাঁহারা সম্রাট্ হইতে স্বাধীন ছিলেন। তাঁহাদিগকে কেবল সেই মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীকে সম্রাট্ বলিয়া মানিতে হইত ও প্রয়োজন মত তাঁহাকে অর্থ ও সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে হইত। ইংরাজসিংহের সহিত ভারতীয় মিত্র-রাজগণের যে সম্বন্ধ আছে, এবং ফিউডালতন্ত্রের ফিউডাল সামন্ত-গণের মণ্ডলেশ্বরের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল, ইহাঁদিগের সহিত সেই রাজচক্রবর্ত্তীরও সেই সম্বন্ধ ছিল।

এই রূপে ভারতের জাতীয় মহানুভূতি সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতম সীমায় আবদ্ধ হইতে থাকিল। জাতীয় সহানুভূতির হ্রাসে প্রাদে-শিক বিদ্বেষানল প্রবলতর হইয়া উঠিল। আর্য্যজাতির অদ্ভুত স্বজাতি-প্রেমিকতা ও আর্য্যধর্ম্মের অবিচলিত স্বসম্প্রদায় হিতৈষণা নিবন্ধন এই বিদ্বেষ ভাব সহস্র সহস্র বৎসর ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অন্তর্নিগূহিত ছিল, কালে সেই স্ফুলিঙ্গ প্রকাণ্ড বহ্নিরূপে

পরিণত হইল। শেষে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পরস্পরের উচ্ছেদসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইল। জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় পৃথুরাজের পতন তাহার চরম দৃষ্টান্ত-স্থল। পৃথুরাজের রাজত্বকালে যখন অন্তর্বিচ্ছেদে ভারত-বক্ষঃ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, তখনই যবনসেনা সিন্ধু পার হইতে সাহস করিয়াছিল। আবার মোগলসাম্রাজ্যের পতনের সময় যখন ভারত অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, তখনই আমেদ সা আবদালী যবনসেনা সহ আবার সিন্ধু পার হইয়া পানিপথ রণক্ষেত্রে সমবেত হিন্দু ও মুসলমান সেনাকে পরাস্ত করিল। সেই পরাজয়ের ব্যবহিত ফল, ইংরাজ কর্তৃক ভারতাধিকার। এক্ষণে যদিও ইংরাজসিংহ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সলিমান হইতে অমরাবতী পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক সীমায় আবদ্ধ সমস্ত ভারতে অভূতপূর্ব্ব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তথাপি এখনও অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য মিত্র বা করদ রাজ্যরূপে বিভিন্ন শাসনাধীন রহিয়াছে। আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এরূপ অবস্থা প্রার্থনীয় মনে করি না। সমস্ত ভারত যদি কখন একজাতীয় শাসনের অধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অগ্রে তাঁহাদিগকে এক প্রবল বৈদেশিক শাসনসমিতির অধীনে আসিয়া সেই মহান্ জাতীয় ভাব শিক্ষা করিতে হইবে। যখন সেই মহান্ জাতীয় ভাব আমাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে নিহিত হইবে, সিদ্ধি আপনা হইতেই আমাদের করতলস্থ হইবে। এখন যদি ইংরাজ জাতি তাহাদিগের জাতীয় মহত্ত্ব গুণে আমাদিগকে তাঁহাদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে আমরা এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য লইয়া কি করি? আজ সিন্ধিয়া আসিয়া বলিবেন 'এ বিপুল ভারতে আমার অপেক্ষা বাহুবল কাহার অধিক? আমি ভিন্ন ইহার সম্রাট্ হইবার উপযুক্ত আর কে? যদি প্রতিবাদ কর ত আমার সুশিক্ষিত সেনা তোমাদিগের রুধিরে ভারতবক্ষঃ প্লাবিত করিবে।' নেপাল, ভূটান, কাশ্মীর, বিকানীয়ার, জয়পুর, ভূপাল, উদয়পুর, হোলকার, বরোদা, মহীসুর নিজাম, ত্রিবাঙ্কুর ক্রমে ক্রমে ইহাঁরা সকলেই আমাদের নিকট তাঁহাদের বলবীর্য্য খ্যাপন করিবেন। আমরা এ

ছত্রিশ কোটী দেবতার কাহাকে মনোনীত করিব? আমরা কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে সাহস করিব না; সুতরাং তাঁহারা আপন আপন আধিপত্য সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত ঘোরতর গৃহানল প্রজ্বলিত করিবেন। সেই সময় হয় ত রুষিয়া সুযোগ পাইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া আবার শত শত বৎসরের জন্য ভারতের সৌভাগ্যতপন তমসাচ্ছন্ন করিবে। সুতরাং রাজ্যতন্ত্রের মূল ছিন্ন করিয়া নিম্নোচ্চকে এক সমতল ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া, ভারতক্ষেত্রকে, ভবিষ্য প্রকাণ্ড সাধারণতন্ত্রের বীজধারণোযোগী করিয়া রাখিতে হইবে, কিন্তু এ বিষয়ে কোন আন্দোলন করা আমাদের অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। আমাদের নিজের বিষয়ে কথা কহিবার আমাদের অধিকার নাই।

ভারতের অধঃপতনের সপ্তম কারণ ধনবৈষম্য। এই বৈষম্য যে কেবল ভারতের দুরদৃষ্টের ফল এরূপ নহে। সকল দেশই এই বৈষম্য অল্প বিস্তর প্রপীড়িত। যে দেশে যখন এই বৈষম্যের পরিমাণ পূর্ণ হয়, তখনই এক একটী বিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসিবিপ্লব ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের সময়ে এই বৈষম্যে ফরাশি জাতির যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। অন্নাভাব-প্রপীড়িত প্রজার শেষ গ্রাস কাড়িয়া লইয়া, তাহাদিগকে পেষকে পেষণ করিয়া, শোষকে শোষণ করিয়া, দাহকে দাহন করিয়া যে অর্থরাশি সংগৃহীত হইত, তাহা রাজপ্রণয়পাত্রী বারাঙ্গনাগণের অঙ্গাভরণে ব্যয়িত হইত। উচ্চশ্রেণী রাজানুগৃহীত ও রাজপ্রসাদভোগী বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও রাজকর হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কৃষক-বহুল নিম্নশ্রেণীই কেবল করভারে প্রপীড়িত। প্রজারা এত দূর নিঃস্ব ও করপ্রদানে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল, যে কর আদায়ের সৌকর্য্য-বিধানের নিমিত্ত রাজাকে নাবিক-দাসত্ব, ফাঁশি কাঠ, ও পীড়নযন্ত্র প্রভৃতিও অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এক দিকে প্রজাসাধারণ—দারিদ্র্য, অনাহার, পীড়া ও নিষ্ঠুর দণ্ডবিধির তাড়নে মৃতপ্রায়;—অন্য দিকে রাজগণের চিন্তাশূন্য উদ্যানকেলি, বনবিহার, নৃত্যগীত, ও বারাঙ্গনাদিগের সহিত হাস্যপরিহাসাদি

ধারাবাহিক প্রমোদ-লহরী। পাপের ভরা পূর্ণ হইবামাত্র ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ফ্রান্সে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে যেরূপ ভীষণ ধনবৈষম্য ঘটিয়াছিল, আমাদের দেশে আজও তত দূর ঘটে নাই বটে, আজও পাপের ভরা পূর্ণ হয় নাই সত্য, কিন্তু যে যে কারণ সত্ত্বে সেই ভরা পূর্ণ হইবে, সে কারণ এখানেও বর্ত্তমান। সমাজ ও আইনের যেরূপ ব্যবস্থা, তাহাতে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এই ঘোরতর ধনবৈষম্য কখন যে অপনীত হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। এই স্থানে যে উচ্চশ্রেণীর উল্লেখ করা হইল, তাহা ধনিমাত্রেরই উপলক্ষণ, এবং যে নিম্নশ্রেণীর উল্লেখ করা হইল, তাহা দরিদ্রমাত্রেরই উপলক্ষণ। বর্ণবৈষম্যে ভারতে যে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী সংগঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ পার্থক্য। ধনী ও নির্ধন—জগতে এ প্রভেদ থাকিবে না, বা থাকা উচিত নয়, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। যিনি পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন, তিনি আজীবন সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র বা পৌত্র সমাজের কিছুই করিল না, অথচ সেই পুত্র বা পৌত্র পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পিতা বা পিতামহার্জ্জিত ধনভোগ করিবেন, আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না। যত দিন না শ্রমোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ জন্মের দৈবঘটনার উপর নির্ভর না করিয়া অপক্ষপাতী ন্যায়ের তুলাদণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, যত দিন না আত্মলব্ধ দ্রব্যজাতের উপর সাধারণ অধিকার প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, তত দিন জগতের ভারভূত অলসশ্রেণীর জগৎ হইতে তিরোভাবের সম্ভাবনা নাই। কি অধিকারে ধনীর পুত্র বা জমিদারতনয় বিনা পরিশ্রমে অন্যোপার্জ্জিত ধন বা অন্য-লব্ধ বিষয় গ্রহণ করিবেন? সেই ধনে বা সেই বিষয়ে তাঁহাদিগেরও যেমন অধিকার, সমাজ-সাধারণেরও সেইরূপ অধিকার। সংসারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহারা নয় পিতৃসম্পত্তির কিঞ্চিদংশ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সমস্ত লইবার কে? এক জন দৈবক্রমে এক ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন। পিতৃবিয়োগের পর প্রাপ্তবয়স্ক হইবামাত্র তিনি অতুল

ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেন। তাঁহার প্রণয়পাত্রী বারাঙ্গনা বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইতে লাগিল। তাঁহার চতুরশ্বযানের তাড়িত সম্পেষণে অনেক দীন দুঃখী হতপ্রাণ বা বিকলাঙ্গ। তাঁহার নির্ম্মম শোষণে প্রজাবৃন্দ হৃতসর্ব্বস্ব! তিনি সমাজের কি করিয়াছেন যে সমাজ তাঁহার জন্য এত সহ্য করিবে? আর নিমে গোয়ালা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ চাষার ঘরে জন্মিয়াছে। সে ভূমিকর্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ উদরপূর্ত্তি করিতে প্রস্তুত আছে; তথাপি সে যে সামান্য টাকার জন্য কর্ষণোপযোগী হাল হেতেল কিনিতে অক্ষম, তাহার জন্য কি সমাজ একটুও ভাবিবেন না? কে ভাবিবে? উচ্চশ্রেণীর ভাবিতে গেলে স্বার্থহানি হয়, সুতরাং উচ্চশ্রেণী কখনই ভাবিবেন না। আমাদের শাসনসমিতিও লক্ষ্মীর বরপুত্র, সুতরাং বৈষম্যের নিদান। উচ্চশ্রেণীর পরিরক্ষণে তাঁহাদেরও স্বার্থ আছে; কারণ কোন প্রকার বিপ্লব উপস্থিত হইলে উচ্চশ্রেণীর সমূহ ক্ষতি; সুতরাং উচ্চশ্রেণী সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতে চেষ্টা করিবেন। বিপ্লবের গতিরোধক বলিয়া উচ্চশ্রেণীর অধিকার-নিচয় শাসনসমিতির কঠোর বিধি পরম্পরা পরিরক্ষিত করিতেছেন। যখন শাসনসমিতি ও উচ্চশ্রেণী পরস্পর-সম্বদ্ধ হইয়া নিম্নশ্রেণীর প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন, তখন নিম্নশ্রেণীর উঠিবার আর আশা কই? সংখ্যা-গণনায় নিম্নশ্রেণী উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা অসংখ্যগুণ অধিক। সুতরাং সেই নিম্নশ্রেণী এরূপ অবনত থাকিতে ভারতের গৌরবের আর কি আশা? আমরা আবার বলিব যে, সেই নিম্নশ্রেণী অধঃপতিত থাকিতে ভারতের কোন আশা নাই। যাঁহারা সেই নিম্নশ্রেণীকে তুলিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল উচ্চশ্রেণীর সাহায্যে ভারতের গৌরব-রবির পুনরুদয় দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

ভারতের জাতীয় অবনতির অষ্টম ও চরম কারণ স্ত্রীপুরুষ-বৈষম্য। এই স্ত্রীপুরুষ-বৈষম্য যে আজ প্রচলিত হইয়াছে বা শুদ্ধ আমাদের দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, এরূপ নহে। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই অল্প বিস্তর পরিমাণে সকল দেশেই চলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা অতি প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ ও মনুসংহিতা প্রভৃতিতেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ

দেখিতে পাই। সেই ঋগ্বেদের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষে ব্রাহ্মণ শূদ্র পার্থক্য বিদ্যমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার-বিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মনুষ্যজাতি। সুতরাং স্ত্রী পুরুষের তুল্যাধিকার-শালিনী। সাম্যতত্ত্বের এই মূল সত্য সেই পুরাকাল হইতেই অস্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সাম্য তত্ত্বের এই মূল মত, প্রতিবাদীরা এই বলিয়া চির কাল খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন, যে প্রকৃতি স্ত্রীজাতিকে যখন পুরুষজাতি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিতে ও শারীরিক বলে হীন করিয়াছেন, তখন সকল বিষয়ে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির সমান হইবে কি রূপে? এই যুক্তি আপাততঃ অখণ্ডনীয় বোধ হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইহা নিতান্ত অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। স্ত্রীজাতির শারীরিক গঠন কোন কোন বিষয়ে পুরুষজাতির অপেক্ষা বিভিন্ন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীজাতি যে সাধারণ-পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে পুরুষজাতির সমকক্ষ নহেন, ইহা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, অসভ্য সমাজে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান শারীরিক পরিশ্রম করে। পাহাড়ী বা জঙ্গলী স্ত্রীরা পুরুষের সঙ্গে সমানে কাঠ কাটে, মাটী খোঁড়ে, বোঝা বয়। তাহাদের স্নায়বীয় বল পুরুষগণের অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন নহে। দীন দুঃখীর ঘরের স্ত্রীলোকেরাও বহুপরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগেরও স্নায়বীয় বল নিতান্ত কম নহে। তবে যে মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর ললনাগণ দিন দিন ননীর পুত্তলী হইতেছেন, তাহার কারণ অস্বাভাবিক পরিশ্রমবিরতি। পুরুষে পরম্পরায় শারীরিক পরি-শ্রম হইতে বিরত হইলে পুরুষজাতিরও এইরূপ স্নায়বীয় অবনতি ঘটিতে পারে ও ঘটিয়াও থাকে। উচ্চশ্রেণীর পুরুষদিগের সহিত তুলনায় পাহাড়ী স্ত্রীলোকদিগের স্নায়বীয় পরিণতি অনেক অধিক। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, শারীরিক বৃত্তির পরিপুষ্টি ও অন্যান্য বৃত্তির পরিপুষ্টির ন্যায় চর্চ্চাসাপেক্ষ। তুমি স্ত্রীলোকদিগের পুরুষদিগের ন্যায় সমান শারীরিক পরিশ্রমে নিয়োগ কর, কালে তাহারা প্রায় পুরুষ-দিগের সমান সবল হইয়া উঠিবে।

বুদ্ধিবৃত্তিতে যে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির ন্যূন নহেন, তাহা আমেরিকায় একরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকায় চিকিৎসাবিজ্ঞান, ব্যবহার-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পাদি সকল বিদ্যায় স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির সমকক্ষতা করিতেছেন। তথায় স্ত্রীজাতি জজ্, মাজিষ্ট্রেট্, বারিষ্টার্, অধ্যাপক, চিকিৎসক—এই সকল মহোচ্চ পদে অভিষিক্ত হইয়া তাহার গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। কোন বিষয়ে যে তাঁহারা ন্যূন, একথা বলিতে আর কাহারও সাহস নাই। স্ত্রীজাতি যে শুদ্ধ এই উচ্চ পদগুলিতে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন এমন নহে, আমেরিকায় সামান্য পোষ্ট মাষ্টারী হইতে সকল কার্য্যেই স্ত্রীলোকের সমান প্রতিযোগিতা।

হৃদ্বৃত্তির পরিপুষ্টি বিষয়ে যে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির ন্যূন নহেন, বরং শ্রেষ্ঠ, এবিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে, স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য অপ্রাকৃতিক ও ন্যায়-নীতিবিগর্হিত।

তর্কের অনুরোধে যদি আমরা স্বীকার করি যে, সম্পূর্ণ সমান অবস্থায় রাখিয়া দেখা গেল যে, স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির সমকক্ষ নহেন, যখন সমকক্ষ নহেন, তখন সমান অধিকার পাইবেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি যে, সমকক্ষ না হইলে সমান অধিকার পাইবার যোগ্য নহে, এ নীতি পূর্ব্বকালের পাশব নীতি, ইহা সাম্যনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। বলবান্ হইলেই দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়ন করিতে হইবে, দুর্ব্বলের প্রাকৃতিক স্বত্ব কাড়িয়া লইতে হইবে, বিদ্বান্ হইলেই মূর্খের বিদ্বেষী হইতে হইবে, বা ধনী হইলেই নির্ধনের উৎপীড়ক হইতে হইবে---একরূপ নিয়ম আর উনবিংশ শতাব্দীতে নীতি-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। একরূপ নীতি এখন উঠিয়া গিয়াছে বলিয়াই দুর্ব্বল ও প্রপীড়িত ভারতবাসী ইংরাজকৃত অত্যাচারের নালিশ ইংরাজেরই নিকট করিতে যান। এই নীতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা ভারতবাসী ইংরাজের নিকট সদ্বিচারের সম্ভাবনা না দেখিতে পাইলে, কাঁদিয়া বিলাতের মাটী পর্য্যন্ত ভিজাইয়া থাকি। ভারতবাসী জানেন যে,

ইংরাজ সাধারণ সাম্যবাদী, সুতরাং এক জন ইংরাজ অবিচার করিতে পারেন, কিন্তু ইংরাজ জাতি কখন অবিচার করিতে পারেন না। এই জন্যই তাঁহাদের এত সভা! এই জন্যই তাঁহাদের এত আবেদন!

আচ্ছা। তাঁহারা যখন একটী ভিন্ন জাতির সাম্যনীতির ফলভোগী হইতে আপনারা ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আপন গৃহে সেই নীতি প্রয়োগ করিবেন না কেন? অগ্রেই গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধা স্ত্রী কন্যা-গণকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত না করিয়া অপরকে নিজের পায়ের শৃঙ্খল উন্মুক্ত করিতে বলা বিড়ম্বনামাত্র। ইংরাজেরা ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীকে রাজনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, সত্য, কিন্তু ভারতের পুরুষগণ যে সেই বিংশতি কোটীর অর্দ্ধেককে ঘোরতর সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কি হইবে? তাঁহারা গৃহে সেই ঘোরতর দাসত্ব-প্রথার পরি-পোষক হইয়া কোন্ মুখে ইংরাজদিগের নিকট আপনাদিগের শৃঙ্খল-মোচন ভিক্ষা করেন? তাঁহারা স্ত্রী জাতিকে যে দুর্গতিতে রাখিয়া-ছেন, সহস্র রাজনৈতিক শৃঙ্খলেও তাঁহাদিগের তাদৃশ দুর্গতি হইবে না।

দাসদিগের যে অধিকার আছে, ভারতীয় নারীজাতির সে অধিকার নাই। দাসেরা বাহিরে যাইতে পারে, ভারতের নারীর নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে যাইবার অধিকার নাই। দাসেরা নিজ নিজ উদরান্ন আপনারা উপার্জ্জন করিতে পারে, ভারতের নারীর কোন প্রকার উপার্জ্জনে অধিকার নাই। দাসেরা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষায় অধিকারী। অধিক কি প্রাচীন রোমে উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের সন্তানগণের শিক্ষার ভার প্রধানতঃ দাসদিগের উপর ন্যস্ত থাকিত, কিন্তু ভারতীয় ললনাগণ সে শিক্ষায় অধিকারিণী নহেন। দাস নিজ মনোমত ভার্য্যা মনোনীত করিতে পারে, কিন্তু ভারতললনার চিরজীবনের সহচর-নির্ব্বাচনে অধিকার নাই। নির্ব্বাচনশক্তি পরিপুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাহার মতামত উপেক্ষা করিয়া তাহাকে এক অপরীক্ষিত যুবকের হস্তে সমর্পণ করা হয়। স্ত্রী থাকিতেও পুরুষ সহস্র বার বিবাহ করিতে পারিবেন, কিন্তু ভারত-

ললনা বিধবা হইলেও তাহার পুনর্ব্বিবাহে অধিকার নাই। পুত্র পিতার সমস্ত ধনে অধিকারী, কিন্তু দুঃখিনী কন্যার তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। পুত্র কন্যার অবর্ত্তমানে মৃত স্ত্রীর স্ত্রীধনে স্বামীর নিব্যূঢ় স্বত্ব, কিন্তু অপুত্রক স্বামীর মৃত্যুতেও স্বামিধনে স্ত্রীর জীবন-স্বত্ব মাত্র। এরূপ স্থলে স্ত্রীর স্ত্রীধন লইয়া স্বামী যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু মৃত পতির সম্পত্তির দান বিক্রয়ে স্ত্রীর কোনও অধিকার নাই। নিজের গ্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে সে সম্পত্তির ব্যয় করিবার তাঁহার অধিকার নাই *। তিনি যদি অতুল সম্পত্তির অধীশ্বরের ভার্য্যা হন, তথাপি তিনি একাশন বই করিতে পারিবেন না †, ইচ্ছা হইলেও এক খানি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে পারিতে পারিবেন না ‡, যে পর্য্যঙ্কে তিনি স্বামীর সহিত শয়ন করিতেন, সে পর্য্যঙ্কে বৈধব্যদশায় শয়ন করিলে স্বামীকে পাতিত করিবেন §, যে গন্ধদ্রব্যের ব্যবহারে তিনি আশৈশব অভ্যস্ত, তাহা তিনি স্পর্শও করিতে পারিবেন না **; অধিক কি একটী সামান্য পান খাইতে ইচ্ছা হইলেও তাঁহার খাইবার অধিকার নাই ††। বিধবা স্ত্রীর পক্ষেত এই ব্যবস্থা। এ দিকে মৃতপত্নীক পতির পক্ষে সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত। তিনি যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন, যত ইচ্ছা খাইতে পারেন, যেমন ইচ্ছা পরিতে পারেন, যেমন ইচ্ছা বিহার করিতে পারেন, কিছুতেই শাস্ত্রের আপত্তি নাই।

---

* स्त्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः स्मृतः ।
नापहारं स्त्रियः कुर्य्युः पतिदायात् कथञ्चन ॥ স্মৃতি ।

† एकाहारः सदा कार्य्यः न द्वितीयः कथञ्चन । স্মৃতি ।

‡ उपभोगोऽपि न सूक्ष्मवस्त्रपरिधानादिना । দায়ভাগ ।

§ पर्य्यङ्कशायिनी नारी विधवा पातयेत् पतिम् ।

** गन्धद्रव्यस्य सम्भोगो नैव कार्य्यस्तया पुनः ।

†† ताम्बूलं विधवास्त्रीणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम् ।
तपस्विनाञ्च विप्रेन्द्र! गोमांससदृशं ध्रुवम् ॥ ব্র, বৈ ২৭ অ ।

পুরুষ অষ্টাদশ বা একবিংশ বৎসর অতিক্রম করিলে সকল বিষয়েই স্বাধীন হইবেন; কিন্তু রমণীর স্বাধীনতা কোন কালেই নাই। তাঁহাকে কন্যাকালে পিতাব, পরিণয়ের পর স্বামীব, স্বামীর অবর্ত্তমানে পুত্রেব, পুত্রাভাবে পতিকুল বা পিতৃকুলেব যে কোন অভিভাবকের শাসনাধীনে থাকিতে হইবে *। পুরুষ সতত নির্ম্মুক্ত থাকিবেন, কিন্তু বমণীব বাহিবে যাইলেই চরিত্র কলঙ্কিত হইবে।

জগতেব যাবতীয় উচ্চ পদে পুরুষের অধিকার; কিন্তু রমণীর অধিকাব সামান্য পবিচাবিকাব কার্য্যে। দাসীবৃত্তি রমণীব গৌববেব জিনিস। গৃহকার্য্যে দক্ষতা লাভ কবিতে পাবিলেই তিনি সকলেব আদবণীয় হইবেন। তাঁহাব দৈনন্দিন কার্য্য-প্রণালী বহ্নিপুবাণে অতি সংক্ষেপে সুন্দবরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। 'তিনি প্রতিদিন শয্যা হইতে উঠিযা পতি-দেবতাকে নমস্কাব করিয়া গৃহতল ও প্রাঙ্গণদেশ গোময বা জলদ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া ও অন্যান্য গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্নান করিতে যাইবেন; স্নান করিয়া আসিয়া আবার তাঁহাকে পতিব চরণে প্রণিপাত কবিতে হইবে; তাহাব পর অন্যান্য গৃহ-দেবতাব পূজা সমাপন পূর্ব্বক অবশিষ্ট গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পতিকে ভোজন কবাইতে হইবে; পতিব আহারান্তে উপস্থিত অতিথিদিগকে ভোজন কবাইয়া সর্ব্বশেষে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বাবা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ উদবপূর্ত্তি কবিতে হইবে †।' ইউরোপ বা আমেরিকায

* बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत् पाणिग्राहस्य यौवने।
पुत्राणां भर्त्तरि प्रेते न भजेत् स्त्री स्वतन्त्रताम्॥ মনু।

† या शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पतिं परम्।
प्राङ्गणे मण्डलं दद्यात् गोमयेन जलेन वा॥
गृहकृत्यन्तु कृत्वा च स्नात्वा गत्वा गृहं सती।
शुद्धं विप्रं पतिं मत्वा पूजयेदिष्टदेवताम्॥
गृहकृत्यं सुनिर्वर्त्य भोजयित्वा पतिं सती।
अतिथिं पूजयित्वा च स्वयं भुङ्क्ते सुखं सती॥

সামান্য দাসের অবস্থাও ইহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। অধিক কি মহর্ষি ব্যাস নিজ কৃত সংহিতায় স্ত্রীকে দাসী বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভার্য্যা দাসীর ন্যায় সতত স্বামীর আদেশের অনুবর্ত্তন করিবেন *। দাম্পত্য-জীবনের অতি কষ্টকর অঙ্গ যে সন্তান পরিপালন, পুরুষ জাতির অপূর্ব্ব কৌশলে তাহা স্ত্রীর হস্তেই অর্পিত আছে। মনুও এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সন্তানের উৎপাদন ও পরিপালন—এ দুইই স্ত্রীর অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য †।

স্ত্রী যে শুদ্ধ স্বামীর দাসী ও সন্তানের ধাত্রী এরূপ নহে, তিনি শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনগণেরও পরিচারিকা। কণ্বমুনি পতিগৃহে গমনকালে শকুন্তলাকে যে সকল নৈতিক উপদেশ প্রদান করেন, তাহার মধ্যে গুরুজনদিগকে সেবা করিবে ‡, এইটীই সর্ব্বপ্রধান। স্ত্রীর অধীনতা যে শুদ্ধ দেহেই পর্য্যবসিত হয়, এরূপ নহে, তিনি মানসিক ও হৃদ্বৃত্তিবিষয়ক স্বাতন্ত্র্যেও বঞ্চিত। তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যে কার্য্য করিতে বলিবে, সে কার্য্য করিবার তাঁহার অধিকার নাই। স্বামীর যাহাতে অভিরুচি, তাঁহাকে তাহাই করিতে হইবে §। পৃথক্ যজ্ঞ, পৃথক্ ব্রত, বা পৃথক্ উপাসনা করিবার তাঁহার অধিকার নাই ‡‡। স্বামীর বাক্যানুরূপ কার্য্য করাই তাঁহার সনাতন ধর্ম্ম *†।

যে শৃঙ্খল স্ত্রীর মত না লইয়া তাঁহার অজ্ঞানাবস্থায় তাঁহার পায়ে

---

* दासीवदिष्टकार्य्येषु भार्य्या भर्त्तुः सदा भवेत्।

† उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्।
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्॥

‡ शुश्रूषस्व गुरून्। অভিজ্ঞান শকুন্তল।

§ यत्र यत्र रुचिर्भर्त्तुस्तत्र प्रेमवती सदा। কাশীখণ্ড।

‡‡ नास्ति स्त्रीणां पृथग् यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्।
বিষ্ণুসংহিতা।

*† स्त्रीभिर्भर्त्तृवचः कार्य्यमेष धर्मः सनातनः।

পরান হইয়াছে, সে শৃঙ্খল এ জীবনে আর ভাঙ্গিবার তাঁহার অধিকার নাই। সমাজ যে পতি তাঁহার স্কন্ধে চাপাইবেন, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ অযোগ্য ও সম্পূর্ণ অপ্রিয় হইলেও কায়মনোবাক্যে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইবে। সে পতির উপাসনায় তিনি স্বর্গে প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন *।

শাস্ত্রে কয়েকটী গুরুতর স্থলে স্ত্রীপক্ষে সে বন্ধনাচ্ছেদনের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর বর্ত্তমান সমাজে সে শৃঙ্খল সকল অবস্থাতেই অভেদ্য। উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পুরুষ যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, শাস্ত্র ও সমাজ তাঁহার অনুমোদন না করুন, তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইবেন না। কিন্তু অভাগিনী নারীর পক্ষে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি নারীর এক বার পদস্খলন হয়, অমনি শাস্ত্র জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিবেন, ব্যভিচারিণীকে নির্ব্বাসিত কর। ব্যভিচারিণীর কথা দূরে থাকুক, অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীও তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্যা ও নির্ব্বাস্যা †। সামাজিক শাসন শাস্ত্রীয় শাসন অপেক্ষা ন্যূন নহে।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বৎসরে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বৎসরে, কন্যামাত্র-প্রসবিনী হইলে একাদশ বৎসরে, কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্যা ‡, স্ত্রী সুরাপী, চিররুগ্না, ধূর্ত্তা, অর্থনাশিনী ও পুরুষদ্বেষিণী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে §। কিন্তু এই সকল পরিত্যক্তা রমণী কি উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা

---

* পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে। বি, স°।

† নির্বাস্যাঃ ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ। যাজ্ঞবল্ক্য।

‡ বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ মনু।

§ মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্বদা॥ মনু।
সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

নির্ব্বাহ করিবেন, তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন-স্পৃহা কিরূপে চরিতার্থ করিবেন, শাস্ত্রে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থায় একমাত্র বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা ভিন্ন তাঁহাদের আর গত্যন্তর নাই।

শাস্ত্রের শাসন অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান সমাজ—শাসন কঠোর-তর। শাস্ত্র বৈষম্য-দূষিত হইলেও স্থানে স্থানে স্ত্রীজাতির প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়াছেন; কথায় কথায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যান্তর-পরিগ্রহের অনুমতি করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য জাতীয়, পতিত, ক্লীব ও চিররুগ্ন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন *। শাস্ত্র যেমন এক দিকে স্বামীর মরণে বা অদর্শনে নারীকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ স্বামী বহু দিন নিরুদ্দেশ হইলে, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে, বা মরিলে স্ত্রীকেও অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন †। কিন্তু আমাদের পৈশাচিক সমাজ কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা দেন নাই। স্বামী এক বার বিবাহ করিয়া গিয়া চির কাল নিরুদ্দেশ থাকুন, স্ত্রীকে চির কালই স্বামীর শয্যা রক্ষা করিতে হইবে। স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করুন, স্ত্রীকে হয় চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে; অথবা প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে স্বামি-ধর্ম্ম-গ্রহণ করিতে হইবে। স্বামী চির-রুগ্ন হউক, স্ত্রীকে আশৈশব স্বামীর সেই রুগ্ন শয্যায় বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইবে। স্বামী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হউন, তথাপি তাঁহার অব্যাহতি নাই। তাঁহাকে আজীবন অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া

---

* স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপি বা॥
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সপ্রাবরণভূষণা॥
(পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়ন-বচন।)

† নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ পরাশর-সংহিতা।

সমাজের তুষ্টিবিধান করিতে হইবে। এরূপ কঠোর সমাজশাসন কথনই সম্পূর্ণ প্রতিপালিত হইতে পারে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তুমি যতই কেন কঠোর নিয়ম কর না, প্রকৃতি আপনার হৃত স্বত্ব দখল করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে। এই সংঘর্ষের পরিণাম ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ও বেশ্যাসংখ্যার বৃদ্ধি।

শাস্ত্রে বিবাহ নানাপ্রকার ছিল। পুরুষজাতি যেমন আপনার মনোমত পত্নী বাছিয়া লইতে পারিতেন, স্ত্রীজাতিও এক পদ্ধতি অনুসারে সেইরূপ আপনার মনোমত পতিনির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। শাস্ত্রের এই কারুণ্যবলেই পতি-পরায়ণা শকুন্তলা ব্যভিচারিণী-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন নাই।

শাস্ত্রে নানাপ্রকার পুত্র স্বীকৃত হইত; এই জন্য ভ্রূণহত্যার আবশ্যকতা হইত না। বর্ত্তমান সমাজে প্রণয়-সঙ্গমের উত্তেজক কারণ, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান; অথচ প্রণয়সঙ্গমোৎপন্ন সন্ততি, সমাজে গৃহীত হইবার ব্যবস্থা নাই। শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই আমরা পঞ্চ পাণ্ডবের নাম শুনিতে পাই। শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই আমরা বীরচূডামণি কর্ণের গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পাই। বর্ত্তমান সমাজের কঠোর শাসনে অসংখ্য রমণীকে হয় এই দুরপনেয় ভ্রূণহত্যাপাপে নিমগ্ন হইয়া সমাজের দাসীত্ব করিতে হই-তেছে, অথবা দুর্নিবার মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। সেই ভ্রূণহত্যা ও সেই বেশ্যাবৃত্তির জন্য সমাজ দায়ী। কেন না, সমাজ স্খলিতপদ রমণীর জন্য উপায়ান্তর রাখেন নাই। সমাজ যাহাদিগকে পাপীয়সী বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহারা কথন আপন ইচ্ছায় ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে বা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহে না।

স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতির অত্যাচারের আরও অনেক উদা-হরণ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আমরা পাঠকবৃন্দকে সেই তালিকা দ্বারা আর আক্রান্ত করিতে চাহি না।

আমরা যে কয় প্রকার বৈষম্যের উল্লেখ করিলাম, ভারতের অস্থিচর্ম্ম

সেই সকল বৈষম্যে জর্জ্জরিত। ইউরোপীয় সমাজেও এই কয়েকটী বৈষম্যের কোন কোনটী কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু এরূপ বিশ্বজনীন বিবিধ বৈষম্য আর কোন দেশেই দেখা যায় না। এত বিভিন্ন বর্ণ, এত বিভিন্ন ধর্ম্ম, এত বিভিন্ন জাতি, এত বিভিন্ন পরিচ্ছদ, এত বিভিন্ন ভাষা, এত বিভিন্ন শাসন, এত স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য আর কোন দেশেই দেখা যায় না। এত বৈষম্য যে দেশে বর্ত্তমান, সে দেশের একতা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই সকল বৈষম্য বিদূরিত না করিয়া যাঁহারা ভারতে রাজনৈতিক একতা সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। অগ্রে সামাজিক একতা, পরে রাজনৈতিক একতা। অগ্রে সমস্ত ভারতবাসী আপনাদিগকে এক-সমাজভুক্ত বলিয়া মনে করুন, পরে রাজনৈতিক একতা আপনিই আসিবে, কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। গৃহে বিচ্ছেদ থাকিতে বাহিরে জয় কখন হয় নাই, কখন হইবেও না। যত দিন না ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান--এক প্রকাণ্ড ভারতীয় জাতিতে পরিণত হইতেছে, যত দিন না হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিন্ধু হইতে প্রাচ্য সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত এক স্বরে ও এক ভাষায় পরস্পরের দুঃখ ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন,—যত দিন না ধনি-নির্ধন-ভেদ ভুলিয়া সমস্ত ভারতবাসী আপনাদিগের দাসত্বে মর্ম্মপীড়িত হইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতেছেন,—যত দিন না সমস্ত ভারতবাসী এক ধর্ম্মভাবে উদ্দীপিত হইতেছেন; যত দিন না স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য-জনিত সমাজিক কুরীতি এবং স্ত্রী জাতির অবরোধবন্ধন, অধীনতা ও অজ্ঞানরাশি ভারতগগন হইতে বিদূরিত হইতেছে,—যত দিন না সমস্ত ভারতবাসী এক শাসনের অধীন হইয়া এক দাসত্বশৃঙ্খলের মর্ম্মন্তুদ আঘাতে এক সহানুভূতিসূত্রে গ্রথিত হইতেছেন,—যত দিন না একটী ভারতবাসীর কেশ স্পর্শ করিলে ভারতবাসিমাত্রেরই শিরে বেদনা লাগিতেছে,—যত দিন না একটী ভারতবাসীর হৃদয়ে আঘাত লাগিলে তাড়িত বেগে ভারতবাসিমাত্রেরই হৃদয়-তন্ত্রী ক্রন্দনস্বরে বাজিয়া উঠিতেছে, যত দিন না আমরা জননী মাতৃভূমির অনুরোধে ইতিহাসের

স্মৃতি মুছিয়া সহস্র-সিরাজ-কৃত অপবাদ মার্জ্জনা করিয়া যবনদিগকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে শিখিতেছি,—যত দিন না আমরা বৌদ্ধ, জৈন, য়িহুদী, খ্রীষ্টান-ভেদ ভুলিয়া এক জননীর সন্তান বলিয়া ভারত-বাসিমাত্রকেই প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে শিখিতেছি,—যত দিন না রাজা, জমিদার ধনগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রজাসাধারণের সহিত মিশিতেছেন,—যত দিন না সুশিক্ষিত ভারতযুবক জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া অশিক্ষিত প্রজাসাধারণের সহিত মিলিয়া তাহাদিগের নিদারুণ দুঃখবিমোচনের চেষ্টা করিতেছেন,—যত দিন না কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায় দেশাচাররূপী রাক্ষসের করাল গ্রাস হইতে নারীজাতির উদ্ধার সাধন করিতেছেন,—তত দিন ভারতের চিরস্থায়ী ও বিশ্বজনীন মঙ্গলের আশা নাই।

যাঁহারা এরূপ আমূল সংস্কার অসম্ভব বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে আজ আমি তিনটী প্রকাণ্ড বিপ্লবের চিত্র ধারণ করিব। বলা বাহুল্য যে, প্রথমটী বৌদ্ধবিপ্লব, দ্বিতীয়টী শিখবিপ্লব ও তৃতীয়টী বৈষ্ণববিপ্লব। যে বৈষম্যবিষে ভারতদেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহার আমূল বিশোধন এই তিন বিপ্লবেরই লক্ষ্য ছিল। তিনটীই এই অভীষ্টসাধনে আশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিল। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনটির একটীও অধিক দিন ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ রহিল না।

প্রথম বিপ্লবের অধিনেতা—ভারতের প্রথম সাম্যাবতার—কপিলবস্তুনগরের রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র অনন্তকীর্ত্তি শাক্যসিংহ। ইনি খৃষ্টীয় শকের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। যখন সমস্ত ভারত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রপীড়নে বিষণ্ণ, ব্যস্ত ও শঙ্কিত হইল; যখন বিপ্রেতর বর্ণ দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণপ্রচারিত ধর্ম্মের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসাধ্য সাধন চেষ্টা, আর তাহার লঙ্ঘনেও তাঁহাদিগের পারত্রিক মুক্তির কোন আশা নাই, তখন তাঁহারা এ বিপদে তাঁহাদিগকে কে উদ্ধার করিবে, এই ভাবনায় আকুল হইলেন। এমন সময় বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া দিগন্তপ্রসারী রবে

তাঁহাদিগকে বলিয়া উঠিলেন, 'ভ্রাতৃগণ! ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে এই ভীষণ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিব। মৎপ্রচারিত ধর্ম্মের বীজ-মন্ত্র সাম্য। এই মন্ত্রবলে বর্ণবৈষম্য উঠিয়া যাইবে; ব্রাহ্মণ-শূদ্র-পার্থক্য থাকিবে না। এই ধর্ম্মের সাধনায় পাপী তাপী, দীন দরিদ্র, রাজা প্রজা সকলেই মুক্তিলাভ করিবে। এ ধর্ম্মের মতে যাগ যজ্ঞ মিথ্যা, বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা। তোমরা সকলে বৈষম্য-দুষ্ট ব্রাহ্মণ্য উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, শান্তি পাইবে'। তিনি মুখে প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি অশেষ-গুণ-শালিনী, পরমরূপবতী যুবতী ভার্য্যা ও একমাত্র শিশু সন্তান এবং রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌপীনধারী হইয়া আত্ম ত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে ভারত আলোড়িত হইল। ভারতের মৃতদেহে আবার জীবন সঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণ-প্রপীড়িত বিপ্রেতর বর্ণ দলে দলে এই নব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ শূদ্রবর্ণের ইহা প্রধান আশ্রয়স্থল হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মোহিনী শক্তি-বলে স্ত্রীজাতিও ঘোরতর অবনতি-গহ্বর হইতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিল। এই নব ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদিগের সমান অধিকার প্রদত্ত হইল। বেদিতে বসিয়া বৌদ্ধ প্রচারিকাগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। মঠধারী, শ্রাবক ও গৃহস্থ। প্রথম শ্রেণী মঠে থাকিয়া উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষা দ্বারা কথঞ্চিৎ জঠরানল নিবারণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভের নিমিত্ত ধ্যান ধারণায় রত থাকিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণী সংসারী লোকদিগকে প্রকাশ্য স্থলে নীতি, ধর্ম্মনীতি, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। অবশিষ্ট লোক সংসারী হইয়া বিষয়-কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। প্রথম দুই সম্মানের পদে স্ত্রীজাতির পুরুষজাতির সহিত সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমরা বৌদ্ধ-মঠধারী ও বৌদ্ধমঠধারিণী, এবং বৌদ্ধ শ্রমণ ও বৌদ্ধ শ্রমণা যুগবৎ শুনিতে পাই। এইরূপ ঐ সকল উচ্চ পদে শূদ্রদিগেরও অন্যান্য উচ্চ বর্ণের সহিত সমান অধিকার ছিল। অধিক কি, বুদ্ধদেব

তাঁহার অসংখ্য শিষ্যবর্গের মধ্যে শূদ্র উপাধিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভাল বাসিতেন। বিপ্রেতর বর্ণের ও স্ত্রীজাতির এই উন্নতিতে ভারত অপূর্ব্ব জীবনী শক্তি প্রাপ্ত হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকাল ভারতের গৌরবের অদ্বিতীয় যুগ। যে সহস্র বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিল, সেই সহস্র বৎসরই ভারতের প্রকৃত গৌরবের সময়। যদি ভারত কখন এক শাসনের অধীন হইয়া থাকে, ত সে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগধরাজ অশোকের সময়। অশোকের সময়ই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। যদি, ভারতের কীর্ত্তিস্তম্ভ কখন সুদূর প্রাচ্যে, সুদূর প্রতীচ্যে, সুদূর উদীচ্যে, সুদূর দক্ষিণে নিখাত হইয়া থাকে, ত সে বৌদ্ধ অশোকের সময়ে। চীন, সিংহল, মিসর, আফ্‌গানিস্থান—অদ্যাপিও বৌদ্ধ নরপতি অশোকের কীর্ত্তিস্তম্ভ বক্ষে ধারণ করিতেছে। ভারতীয় নরপতিবৃন্দ যদি কখন বৈদেশিক নরপতিবৃন্দের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকেন, ত তাহা এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালেই। প্রবল-পরাক্রমশালী আণ্টিয়োকস, টলেমি, আন্তিগোনাস্‌ প্রভৃতি যবন নরপতিগণ মগধের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শূদ্র রাজবৃন্দের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে শ্লাঘ্য মনে করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য, অশোক, মহেন্দ্র প্রভৃতি নরপতিবৃন্দের যশোরাশি, ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া নানাদেশ ধবলিত করিয়াছে। যদি কখন ভারত হইতে ধর্ম্মপ্রচারকগণ নানা দেশ গমন পূর্ব্বক নানা জাতিকে ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন, তবে সে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে। চীন, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া, জাপান, শ্যাম, সিংহল, অধিক কি সুদূর সাইবীরিয়া ও ল্যাপলাণ্ড পর্য্যন্তও—ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারকদিগের মোহিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া অদ্যাপিও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ বুদ্ধ-প্রচারিত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু যে ভারতে সেই ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভাব, সে ভারতে সে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বহু দিন বিলুপ্ত হইয়াছে। সে দীপালোক বিনা আজ ভারত অন্ধকার

সে দীপালোক নিভাইয়া বৈষম্যপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আবার সমস্ত ভারত তমাসচ্ছন্ন করিয়াছে। আবার বিপ্রেতর বর্ণ ও স্ত্রীজাতি কঠিন দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রতিক্রিয়ায় সেই শৃঙ্খল এখন কঠিনতর হইয়াছে! ভারতের উন্নতি-স্রোতে এখন প্রবলতর ভাঁটা পড়িয়াছে!

খ্রীষ্টদেব ছয় শত বৎসর পরে যে অমূল্য সাম্যনীতি প্রচার করিয়া রোম সাম্রাজ্যের দাসত্ব-প্রপীড়িত ইউরোপে নব জীবন সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব সাম্যনীতি প্রচার করিয়া ভারতের সমীকরণ করিয়াছিলেন। আজ ভারতে সে সাম্যনীতি প্রচারিত থাকিলে ভারত আজ ইউরোপের সমকক্ষ হইতে পারিত, কিন্তু কি পাপে ভারত আজ সেই অমূল্য ধনে বঞ্চিত? কোন্ পাপে বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বৈদেশিক খ্রীষ্টানের নিকট নীতি শিক্ষা করিতে হয়? বুদ্ধধর্ম্মে মিলে না, এমন কোন্ নীতি খ্রীষ্টধর্ম্মে বিদ্যমান? আজ ভারতীয় যুবককে কম্‌তের নিকট পজেটিব্ ধর্ম্ম শিখিতে যাইতে হইবে কেন? পজেটিব্ ধর্ম্মের মূল সূত্র বৌদ্ধধর্ম্মেও নিহিত আছে। তবে এ অমূল্য ধর্ম্মের ভারতে কেন বিলয় হইল? এ গুরুতর বিষয় এক বার ভাবিয়া দেখা যাউক।

কম্‌তের ন্যায় বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব লইয়া কোন তর্ক তুলেন নাই বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, কারণ তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, জগতের কোন চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই। সাংখ্যের ন্যায় বুদ্ধের মতেও প্রকৃতি স্বয়ংসৃষ্ট। বুদ্ধ যে পরলোক স্বীকার করিয়াছেন, তাহার নাম জন্মান্তর। সেই পুনর্জন্মরূপ পরলোকের উচ্ছেদসাধন করাই নাম মুক্তি। সেই মুক্তিলাভ করাই বৌদ্ধজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা এক প্রকার নিরীশ্বর ও পরলোকবিদ্বেষী। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম্ম পৃথিবীর লোক-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের শান্তিনিকেতন। এইরূপ বিশ্বজনীন অস্তিত্ব সত্ত্বেও কে বলিবেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মে ঈশ্বর ও

পরলোক নাই বলিয়াই ইহা ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইল না? সুতরাং ইহার ধ্বংসের কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের প্রধান কারণ ব্রাহ্মণদিগের অলৌকিক ধর্ম্মানুরাগ, অবিচলিত স্বশ্রেণী-হিতৈষিতা এবং অদ্ভুত আত্মীকরণনৈপুণ্য। যখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লুপ্ত-প্রায়, তখন তাঁহারা আপনাদিগের ধর্ম্মের জন্য, স্বশ্রেণীর গৌরব-রক্ষার জন্য—প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হইলেন। শঙ্করাচার্য্য ও তৎসদৃশ আচার্য্যমুখ্যগণ চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আধিপত্য-রক্ষার জন্য আর্য্য ধর্ম্মের নূতন করিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন। যেমন বৌদ্ধেরা বেদিতে বসিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ বেদিতে বসিয়া বৈদিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। বৌদ্ধেরা যেরূপ বিপ্রেতর বর্ণকে বিনয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ অনার্য্য জাতি সকলকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। এই অসভ্য আদিম নিবাসীরা সাকারোপাসক ছিল। ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের তুষ্টি বিধানার্থ তাহাদিগের দেব দেবীকেও আপনাদিগের দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইলেন।—

"উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"।

সাধকেরা নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় অসমর্থ। তাহাদিগের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত নিরাকার ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা গেল—এই বলিয়া তাঁহারা আর্য্য ধর্ম্মের অদ্বৈতবাদের সহিত এই নবাবতারিত পৌত্তলিকতার সামঞ্জস্য বিধান করিলেন।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের দ্বিতীয় কারণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের আড়ম্বর-শূন্যতা। সাকারোপাসনার সহিত হিন্দুধর্ম্মে নানাপ্রকার উৎসব আসিয়া জুটিল, কিন্তু বৈরাগ্যমূলক বৌদ্ধ ধর্ম্মে কোন প্রকার উৎসব, কোন-প্রকার আড়ম্বর ছিল না। সংসার বৈরাগ্যই বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল মন্ত্র, বাহ্য বস্তুতে অনাস্থাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান মুক্তি-সাধন। সংসারী লোকসাধারণও শূন্য-আড়ম্বরপ্রিয়। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বাঁধ ভাঙ্গিতে লাগিল।

লোকসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা আর একটী যন্ত্রের উদ্ভাবনা করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানমূলক। সুতরাং এ ধর্ম্মের ধারণায় চিন্তাশক্তির কিঞ্চিৎ উদ্দীপনা চাই। লোক-সাধারণ চিন্তাশক্তির পরিচালনে নিতান্ত অনিচ্ছুক; সুতরাং অশি-ক্ষিত জনসাধারণের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ নীরস বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এমন সময় ব্রাহ্মণেরা প্রচার করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েতেই মুক্তি, জ্ঞানবানের মুক্তি জ্ঞানে, অজ্ঞা-নের মুক্তি ভক্তিতে। ভক্তির মোহিনীশক্তিপ্রভাবে অশিক্ষিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণ আবার ফিরিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের চতুর্থ কারণ প্রচারকার্য্যে অব-হেলা। যখন ব্রাহ্মণেরা প্রাণবিসর্জ্জনেও বৌদ্ধদিগের উচ্ছেদ-সাধনে ব্রতী ছিলেন, তখন বৌদ্ধেরা প্রধানতম শ্রাবকদিগকে দেশদেশান্তরে প্রচার-কার্য্যে পাঠাইলেন। কেবল মঠধারীরা প্রচার-কার্য্যের নিমিত্ত দেশে রহিলেন, কিন্তু রাজ-প্রদত্ত ধনে মঠধারীরা অতিশয় ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রচার-কার্য্যের সহিত তাঁহাদিগের জীবিকার কোন সম্বন্ধ না থাকায়, তাঁহারা ক্রমে প্রচার-কার্য্যে অতিশয় উদা-সীন হইয়া উঠিলেন। এ দিকে প্রচারকার্য্যের সহিত ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে জনসাধারণকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের পঞ্চম ও শেষ কারণ বৌদ্ধদিগের অন্তর্বিচ্ছেদ। যে অবিচলিত স্বশ্রেণীহিতৈষিতা নিবন্ধন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অদ্যাপি ভারতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, বৌদ্ধদিগের মধ্যে সে স্বশ্রেণী-হিতৈষণা বড় অধিক দেখা যায় না। প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা স্বশ্রেণীর লোক নাস্তিক হউক বা প্রকৃতিবাদী হউক, সকলকেই স্বশ্রেণীভুক্ত বলিয়া আলিঙ্গন করিতেন; কিন্তু বৌদ্ধেরা সামান্য মতভেদ লইয়া আপ-নাদিগের মধ্য হইতে অনেককে সম্প্রদায়-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে লাগি-লেন; কিন্তু বহিষ্কৃতের সংখ্যা ক্রমে এত বাড়িতে লাগিল যে,

তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইলেন। এই রূপে শাক্য-সিংহের মৃত্যুর দুই শত বৎসরের মধ্যেই বৌদ্ধগণ অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া উঠিলেন। এক দিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নব-জীবন-প্রাপ্তি, অন্য দিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই ভীষণ সাম্প্রদায়িকতা। সুতরাং এই সকল কারণে অচির-কাল-মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে বিলুপ্ত হইল।

ভারতের দ্বিতীয় সাম্যাবতার গুরুগোবিন্দ সিংহ। নানক শিখ-সম্প্রদায়ের জন্মদাতা মাত্র, গুরুগোবিন্দই এই সম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় উন্নতিবিধাতা। ইনিই শিখসম্প্রদায়কে একটী সামান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে একটী প্রকাণ্ড রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত করেন। তাঁহারই সাম্যতন্ত্রের মোহিনী-শক্তি-প্রভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই শিখগণ একটী নগণ্য ধর্ম্মসঙ্ঘ হইতে অদ্ভুতজীবনীশক্তি-বিশিষ্ট একটী প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত হয়। গুরুগোবিন্দ এক জন সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক না হউন, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও নানকের ন্যায় তিনি অতি মহান্ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত না হউন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সার্ব্ববিষয়িক সংস্কারক ভারতে আর দ্বিতীয় জন্মে নাই। এরূপ বিশ্বজনীন সাম্যের ভাবে ভারতে আর কোন সংস্কারক কখন উদ্দীপিত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। আমরা এ প্রস্তাবে যত প্রকার বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য ভিন্ন আর সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যের মূলে গুরুগোবিন্দসিংহ কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ ছিল না; হিন্দু মুসলমান ভেদ ছিল না; রাজা প্রজা ভেদ ছিল না; ধনী নির্ধন ভেদ ছিল না; এবং পণ্ডিত মূর্খ ভেদও ছিল না। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক সমাজ, এক শাসন এবং এক প্রাণ। শিখসম্প্রদায়ের হৃদয় যেন এক তারে গাঁথা। একের উন্নতিতে সাধারণের সুখ এবং একের দুঃখে সাধারণের দুঃখ। একটী শিখের গাত্র স্পর্শ কর, সমবেদনার মোহিনীশক্তি-প্রভাবে তাড়িত বেগে সমস্ত শিখসম্প্রদায়ে বেদনা অনুভূত হইবে। প্রধান আচার্য্য হইতে সামান্য মন্ত্রশিষ্য পর্য্যন্ত, সকলেই ভ্রাতৃভাবে

অনুপ্রাণিত। সমস্ত শিখসম্প্রদায় যেন একটী প্রকাণ্ড পরিবার। সকলেরই এক লক্ষ্য এবং এক উদ্দেশ্য। মাতৃভূমি ও ঈশ্বর সকলেরই সমান উপাস্য। মাতৃভূমির উদ্ধারসাধন সকলেরই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের প্রধান সাধন, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববন্ধন। সেই ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করিবার নিমিত্ত শিখেরা আপনাদিগকে এক জননীর গর্ভ-সম্ভূত বলিয়া ব্যক্ত করিতেন। হিন্দু, মুসলমান, য়িহুদী, খ্রীষ্টান—যিনিই এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, তিনিই "খাল্সা" পবিত্র বা বিমুক্ত-সংজ্ঞায় আখ্যাত হইবেন। দীক্ষার দিন হইতেই শিখমাত্রকেই কয়েকটী গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাকে জাত্যভিমান, কুলমর্য্যাদা, বর্ণভেদ, পণ্ডিত মূর্খ ভেদ, ইতর-ভদ্র-ভেদ ভুলিয়া, বিভিন্ন ক্রিয়াপদ্ধতি, বিভিন্ন ধর্ম্মশাসন পরিত্যাগ করিয়া, এক রন্ধনে ও এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে হইবে,—এক ঈশ্বরের উপাসনায় নিমগ্ন হইতে ও এক ধর্ম্মশাসনের অধীন থাকিতে হইবে,—দুশ্ছেদ্য একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া, এক প্রাণে জীবনবিসর্জ্জনেও মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন করিতে হইবে, এবং মাতৃভূমির দাসত্বপ্রদায়িনী যবনজাতির উচ্ছেদসাধনে সতত বদ্ধপরিকর থাকিতে হইবে।

যে শিখসম্প্রদায় এত দিন নিরীহ যোগীর ন্যায় নির্জ্জনে কেবল ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, গুরুগোবিন্দের মন্ত্রপ্রভাবে সেই শিখ-সম্প্রদায় এক্ষণে একটী মহান্ জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইলেন। প্রত্যেক শিখ এক্ষণে এক একটী দুর্জ্জেয় রণবীর হইয়া উঠিলেন। দুর্দ্দান্ত আরঞ্জীবের সিংহাসন টলিল। সমস্ত ভারত খাল্সা সৈন্যের সিংহ-নাদে কাঁপিয়া উঠিল। শিখসম্প্রদায়ের পবিত্রতা, একতা ও তেজঃ-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অসংখ্য হিন্দু মুসলমান এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিলেন। আরঞ্জীবের ধর্ম্মান্ধতা ও কঠোর ব্যবহার নিবন্ধন দীক্ষিতের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ধর্ম্মান্ধ সম্রাটের নয়ন উন্মীলিত হইল; কিন্তু গুরুগোবিন্দ যে অনল জ্বালিয়াছিলেন, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। বরং মোগল সৈন্যরূপ ইন্ধনে সে অনল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। অজেয় শিখসেনা মোগলসেনাকে

পরাস্ত করিয়া যবনাধিকৃত দুর্গ সকল দখল করিতে লাগিল; কিন্তু ভারতের অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য অধিক দিন থাকিবার নহে। শিখসম্প্রদায় একটী পরিণত জাতি না হইতেই আবাধ্য গুরুগোবিন্দ সিংহ কোন ঘাতকের অতর্কিত অস্ত্রাঘাতে মানবলীলা সংবরণ করেন। ভারতের পিটার্ ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাদর্ নামক স্থানে এই রূপে অকালে কাল-কবলে পতিত হইলেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ আর কিছু কাল জীবিত থাকিলে, ভারতের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। যদি গুরুগোবিন্দের স্থান পূরণ করিতে সমর্থ, শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক জনও থাকিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না।

কিন্তু শিখ-সম্প্রদায় গুরুগোবিন্দ সিংহের নিকট হইতে যে সঞ্জীবনী শক্তি পাইলেন, তৎপ্রভাবেই ভারতে একটী অজেয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই জাতির রণপ্রতিভা রণজিৎ সিংহের সময়েই সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ইহাঁদিগের সাহায্যে রণজিৎ সিংহ ব্রিটিশ সিংহের নিকট হইতেও "পঞ্জাব-সিংহ" উপাধি প্রাপ্ত হন। রণজিতের মৃত্যুর পর এই অজেয় জাতি উপযুক্ত অধিনায়ক-অভাবে বিশীর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল। এই জাতি মরণ-কালেও চিলেন্‌ওয়ালায় আপনাদিগের অদ্ভুত রণনৈপুণ্যের ও অবিচলিত আত্মত্যাগের প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছে। ঐ চিলেন্‌ওয়ালা ভারতের থার্ম্মাপিলি।

এখনও ভারতে শিখসম্প্রদায় আছে বটে, কিন্তু এ শিখসম্প্রদায় গুরুগোবিন্দের শিখসম্প্রদায় নহে। হিন্দুধর্ম্মের অদ্ভুত মহিমায় আবার সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য, সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার অনুচর দাসত্বও সেই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ ও রণজিতের শিখদল জাতীয় স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক শিখদল ভারত-চরণে বৈদেশিক শৃঙ্খল দৃঢ়বদ্ধ করিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে!

ভারতের তৃতীয় সাম্যাবতার চৈতন্য। নানকের ন্যায় চৈতন্যও একমাত্র হরিভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দের ন্যায় চৈতন্যও ব্রাহ্মণ শূদ্র ও হিন্দু মুসলমান—এক ঢাল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি হিন্দু, কি মুসলমান—ভক্ত-মাত্রই চৈতন্যের নিকট সমান আদরণীয়। চৈতন্যের নিকট স্ত্রীজাতিও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন না। বুদ্ধের ন্যায় তিনিও প্রচারকের উচ্চ আসন স্ত্রীজাতিকে প্রদান করেন এবং অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে পত্নীনির্ব্বাচনে পুরুষদিগের যেমন অধিকার, স্বামিনির্ব্বাচনেও স্ত্রীলোকদিগের সেইরূপ অধিকার। স্ত্রী ব্যভিচারিণী বা প্রতিকূলাচারিণী হইলে পুরুষ যেমন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্বামী ব্যভিচারী বা প্রতিকূলাচারী হইলে, স্ত্রীও সেইরূপ স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। পত্নীবিয়োগে স্বামীর যেমন পুনর্ব্বার পত্নীগ্রহণে অধিকার, পতিবিয়োগে স্ত্রীরও পুনঃপরিণয়ে সেইরূপ অধিকার। বৈষ্ণবীদিগের অবরোধবন্ধন নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংস্পর্শে স্ত্রী শূদ্র সর্ব্বপ্রকার অধীনতাশৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত। অধিক কি—যে চণ্ডাল ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য, যে বেশ্যা সকল সমাজেরই পরিত্যজ্যা, তাহারাও ভক্ত হইলে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে *। বৈষ্ণবমাত্রকেই পরস্পরের অন্নগ্রহণ ও পরস্পরের সহিত আদান প্রদান করিতে হইবে। আধুনিক বৈষ্ণবেরা যাহাই হউন, প্রাথমিক বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য ছিল না। তথাপি এ সম্প্রদায়ের এত শীঘ্র অবনতি ও এ ধর্ম্মের এত শীঘ্র পতন কেন হইল?

তিনটী কারণে এ সম্প্রদায়ের এত শীঘ্র অবনতি ও এ ধর্ম্মের এত শীঘ্র পতন হইল। প্রথম কারণ—বৈষ্ণবদিগের নিরবচ্ছিন্ন-ভক্তিমূলতা। চৈতন্যের মতে নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিতেই মুক্তি। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যেমন নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানমূলক হওয়ায় জনসাধারণের নিকট নীরস

* श्वपचोऽपि द्विजश्रेष्ठो विष्णुभक्तिपरायणः। (বি, পু,)

বলিযা প্রতীত হইয়াছিল, বৈষ্ণব-ধর্ম্মও সেইরূপ নিববচ্ছিন্ন ভক্তি-মূলক হওয়ায, জ্ঞানী জনেব অশ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিল। জ্ঞানী লোকে অন্ধ-ভক্তি-পববশ হইতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন; সুতবাং জ্ঞানী ও পণ্ডিত এ ধর্ম্মসম্প্রদায-ভুক্ত হইলেন না, কেবল অশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষেই এ সম্প্রদায় পবিপূর্ণ হইতে লাগিল। এই অশিক্ষিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় চৈতন্যেব অদ্বৈতবাদ ভুলিয়া ক্রমে ঘোব পৌত্তলিক হইয়া উঠিল। রোমান্ ক্যাথালিকেবা যেমন যিশু ও মেরী প্রভৃতির উপাসনা কবিযা থাকেন, ইহারাও সেইরূপ চৈতন্য ও চৈতন্য-জননীর উপাসনা আবম্ভ কবিল। অন্ধ বিশ্বাসে তাহাদিগেব বুদ্ধি-বৃত্তি ক্রমেই অধিকতব হীনপ্রভা ধাবণ কবিল। আধুনিক বৈষ্ণব-গণ ইহাব জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অবনতিব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মেব পতনেব দ্বিতীয় কারণ বৈষ্ণবসাধাবণেব সংসাব-বৈবাগ্য। আমরা পূর্ব্বে বলিযাছি যে, বৌদ্ধেবা স্বসম্প্রদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কবিযাছিলেন—মঠ-ধাবী, শ্রাবক ও আশ্রমী। বৌদ্ধধর্ম্মেব পবিপুষ্টি-সাধন ও প্রচাব-কার্য্য প্রথম দুই শ্রেণীব হস্তে ন্যস্ত থাকিত। ইঁহাবাই সংসাবত্যাগী ও জীবিকা নির্ব্বাহেব নিমিত্ত পবপ্রত্যাশী। আশ্রমী বৌদ্ধদিগেব সহিত তুলনায় ইহাদিগেব সংখ্যা নগণ্য মাত্র। বৌদ্ধ আশ্রমীবা বৈষযিক উন্নতি-বিষযে সতত বত থাকিতেন, সুতবাং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় দাবিদ্র্য ঘটিতে পাবে নাই; কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ কোন শ্রেণীবিভাগ নাই।

বৈষ্ণবমাত্রই অনাশ্রমী, বৈষ্ণবমাত্রই ভিক্ষোপজীবী। বৈষ্ণবেবা বিবাহ কবিতে পারে বটে, কিন্তু বৈষ্ণব বৈষ্ণবী উভয়কেই ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কবিতে হইবে। যে সম্প্রদায়েব সকলেই ভিক্ষুক, সে সম্প্রদায় জগতে, কখন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। সুতরাং ক্রমে বৈষ্ণবেবা সকলেবই অশ্রদ্ধাব পাত্র—সকলেরই বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠিল।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়েব অবনতিব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মেব পতনের তৃতীয়

কারণ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জাতীয় ভাবের অভাব। গুরুগোবিন্দের ন্যায় চৈতন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে একটী প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত করিবেন বলিয়া কখন ভাবেন নাই। এ মহান্ ভাব তাঁহার সঙ্কীর্ণ ও ধর্ম্মান্ধ অন্তরে স্থান পায় নাই। সুতরাং মহান জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় তাঁহার ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কখন অনুপ্রাণিত হয় নাই। নানকের ন্যায় তিনি একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাত্র। চৈতন্য গুরুগোবিন্দের ন্যায় সমস্ত ভারতকে এক ধর্ম্মশাসন ও এক রাজনৈতিক শাসনের অধীনে আনিবার মহৎ সঙ্কল্প কখন মনে ধারণা করিতেও সমর্থ হন নাই। তাঁহার অপরিপক্ক বুদ্ধিবৃত্তি এরূপ প্রকাণ্ড ভাব ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। এই জাতীয় ভাব-বিরহেই বৈষ্ণব সম্প্রদায় অচিরকাল মধ্যেই আপনাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইল; ক্রমে ক্রমে ইহা হিন্দুজাতির একটী ক্ষীণ শাখারূপে পরিণত হইল। হিন্দুধর্ম্মের সংস্রবে সেই সকল বৈষম্য অনেক পরিমাণে আসিয়া জুটিল। এই জন্য এখন আমরা বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ-শূদ্র-পার্থক্য দেখিতে পাই।

বুদ্ধ গিয়াছেন, গুরুগোবিন্দ গিয়াছেন, চৈতন্য গিয়াছেন—এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের অতুল কীর্ত্তিও বিলুপ্তপ্রায়। ভারত আবার ঘোরতর তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ-প্রচারিত ঘোর বৈষম্য আবার ভারতবাসীর স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। আবার সেই বর্ণভেদ, সেই জাতিভেদ, সেই ধর্ম্মভেদ! আবার ব্রাহ্মণ শূদ্রে ও হিন্দু মুসলমানে সেই ঘোরতর বিদ্বেষ! স্ত্রীজাতির প্রতি আবার সেই ঘোর অত্যাচার। জাতীয় ভাবের অভাবে আবার সেই ছত্রভঙ্গতা! আবার স্ত্রী-শূদ্রের শাস্ত্রে অনধিকার!

একটী প্রকাণ্ড জাতীয় ভাবের অভাবে সমস্ত ভারতবাসী সহস্র জাতিতে—সহস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত রহিয়াছে। একটী জাতীয় ভাষার অভাবে ভারত অসংখ্য প্রাদেশিকতায় পরিণত হইয়াছে। একটী সমগ্র ভারতব্যাপী ধর্ম্মের অভাবে, অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি পরস্পর বিদ্বেষ-বিশিষ্ট! বিদ্যাবৈষম্যে পণ্ডিত মূর্খ পরস্পর-

বিদ্বেষ-বিশিষ্ট! স্ত্রী-পুরুষ বৈষম্যে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর-সাহানুভূতি-শূন্য জেতৃ-বিজিত-বৈষম্যে আমরা মর্ম্মপীড়িত!

সমস্ত ভারত এক শাসনের অধীন না হওয়ায়, ভারতে বিশ্বজনীন সমবেদনা নাই। দুর্ভিক্ষে কাশ্মীর উচ্ছিন্ন হইল, তাহা কয় জন শুনিলেন, তদ্বিষয়ে কয় জন ভাবিলেন, কয় জন তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত একটী কপর্দ্দকও পাঠাইলেন? মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষের সময় কত সভা, কত চাঁদা! কিন্তু কাশ্মীর-দুর্ভিক্ষের জন্য কয়টী সভা হইয়াছিল, কি চাঁদা উঠিয়াছিল? সভা দূরে থাক, চাঁদা উচ্ছিন্ন যাউক, কই এ বিষয়ে কোন কথোপকথনও ত শুনিতে পাই নাই। কেন না কাশ্মীর স্বতন্ত্র, কাশ্মীর স্বাধীন, কাশ্মীরের সহিত আমাদের জাতীয় সমবেদনা নাই! কিন্তু কাশ্মীর স্বাধীন কিসে? কাশ্মীরের রাজা ইংরাজের গোলাম, তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান ইংরাজ-ইঙ্গিতে চালিত; কাশ্মীরের প্রজাসাধারণ এই গোলামের গোলাম; সুতরাং তাহাদিগের অবস্থা আমাদিগের অপেক্ষাও শোচনীয়। তাহাদিগকে দাসত্বের সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, অথচ তাহারা ইংরাজ সভ্যতার ফলভোগে অনধিকারী। যখন দাসত্ব অনিবার্য্য, তখন প্রবলতম দাসপতির অধীনে থাকাই সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর, তখন সুসভ্য দাসপতির অধীনে থাকিয়া সভ্যতা শিক্ষা করা প্রার্থনীয়, তখন সাম্যবাদী দাসপতির অধীনে থাকিয়া সাম্যের মোহমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়াই ভাল। আমাদের এক্ষণে জাতীয় শিক্ষার সময়। এ সময় একটী প্রবল-পরাক্রান্ত সভ্যতম শাসন-সমিতির অধীনে থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে ইংরাজ আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছেন। যত দিন এই প্রয়োজন থাকিবে, যত দিন আমাদের একতাবন্ধন পূর্ণ না হইবে, তত দিন ইংরাজ আমাদের উপর রাজত্ব করিবেন, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে ইংরাজ আপনিই যাইবেন; আপনি না যান, যে প্রাকৃতিক বা দৈবী-শক্তি-প্রভাবে তাঁহারা ভারতে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই প্রাকৃতিক বা দৈবী শক্তি প্রভাবেই তাঁহারা

ভারত হইতে বিদূরিত হইবেন। সে সময়ের এখন অনেক বিলম্ব আছে; সুতবাং সে ভাবনায় আমাদিগের এখন প্রয়োজন নাই।

আমাদেব ভাবনার আবও যথেষ্ট জিনিস আছে। যে যে উপাদান-সামগ্রীতে জাতীয় জীবন গঠিত হয়, আমাদিগকে এক্ষণে সেই উপাদান-সামগ্রীর আহবণ করিতে হইবে। আমাদেব এক্ষণে আমাদিগকে এক ভারতীয় জাতি বলিবাব অধিকাব নাই। ভৌগোলিক একতা ভিন্ন আমাদের এখন আব কোন একতা নাই। আমাদিগকে নূতন করিয়া একটী ভারতীয় জাতি গঠিত হইবে। সমস্ত ভারতে এক ধর্ম্ম, এক সাধাবণ ভাষা সংস্থাপন করিতে হইবে। ধনী, নির্ধন ও পণ্ডিত মূর্খ অভিমান ভুলিতে হইবে। স্ত্রী পুরুষে সমতা বিধান কবিতে হইবে। এক সমবেদনা-সূত্রে সমস্ত ভারতকে অনুস্যূত কবিতে হইবে। এই মহতী সিদ্ধি বহুকালব্যাপি-প্রগাঢ-সাধনা-সপেক্ষ। সুতরাং আমবা এক্ষণে সেই সাধনায় নিমগ্ন হইব।

এক্ষণে দেখি, আমাদের কি সাধন-সামগ্রী আছে। আমবা কোন্ ভিত্তিব উপব বসিয়া এই সব সাধন করিব? হিন্দুধর্ম্ম অতি প্রাচীন ও অতি প্রকাণ্ড ভিত্তি বটে, কিন্তু সে ভিত্তি অতি জীর্ণ, আব বিশেষতঃ তাহা আত্ম-পৃষ্ঠোপবি সকল জাতিকে ধাবণ কবিতে অনিচ্ছুক। সুতবাং প্রিয় হইলেও অগত্যা আমাদিগকে সে ভিত্তি পবিত্যাগ কবিতে হইবে। সে ভিত্তি পরিত্যাগ কবিব বটে, কিন্তু সে ভিত্তিব যে উপাদান-সামগ্রী সতেজ আছে, তাহা গ্রহণ কবিব। মুসলমান-ধর্ম্মও অতি বিদ্বেষপূর্ণ, সুতবাং সে ভিত্তিও পবিত্যাগ কবিতে হইবে; কিন্তু তাহাতেও যে সজীব উপাদান আছে, তাহা গ্রহণ কবিতে হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্ম বিজেত্রী জাতির ধর্ম্ম, সুতরাং সে ধর্ম্ম কখন বিজিত জাতিব প্রীতিকর হইবে না; সুতরাং সে ভিত্তিও আমাদিগকে পবিত্যাগ করিতে হইবে; অথচ সে ভিত্তিরও গ্রহণযোগ্য উপাদান সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। এই রূপ অন্যান্য ধর্ম্মেব অভ্যন্তবেও অনেক রত্ন নিহিত আছে। সেই সকল উপাদান-সামগ্রী লইয়া একটী নূতন ধর্ম্ম-ভিত্তি গঠিতে হইবে। মূল ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সকল উপাদানে গঠিত,

সুতরাং একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মেরই ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম হইবার সম্পূর্ণ অধিকার। যদি একটী লৌকিক ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে, ত ব্রাহ্মধর্ম্মই ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম হইবে। কারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্মেরই—বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের সারসঙ্কলন মাত্র; এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য, ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই আদরণীয়। সুতরাং এ ধর্ম্ম-গ্রহণে ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহের বিশেষ আপত্তি হইবে না। এতদ্ভিন্ন আর একটী কারণ আছে। উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ একটী প্রকাণ্ড ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত, সে ভিত্তি সাম্য। খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যতীত বর্ত্তমান ভারতের আর কোন প্রাচীন ধর্ম্মের সহিত বিশ্বজনীন সাম্যের ভাব মিশ্রিত নাই। কারণ সাম্যমূলক বৌদ্ধ, শিখ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতে এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সকল ধর্ম্মে এখন আবার বিবিধ বৈষম্য আসিয়া জুটিয়াছে।

কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে শাক্য-সিংহ, যিশু বা গুরুগোবিন্দের ন্যায় একজন অলৌকিক-প্রতিভাশালী নিষ্কাম ও আত্মত্যাগী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক নাই। এই জন্যই এত অল্প দিনের মধ্যে ইহাতে এত দলাদলি ও এত মতভেদ ঘটিয়াছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ৪।৫ শত বৎসর পরে উপযুক্ত নেতা বিরহে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, এই নবোদিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্কুরেই সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কেশব ব্রাহ্মধর্ম্মের আরও দুই একটী দোষ ঘটিতেছে। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের ন্যায় কেবল ভক্তিমূলক হইয়া উঠিতেছে। এরূপ হইলে ইহা অচির-কাল-মধ্যেই শিক্ষিত সমাজের অসেব্য হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ ইহা আবার স্ত্রীপুরুষ-বৈষম্যে আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ন্যায় ইহাতে বৈরাগ্যও আসিয়া জুটিতেছে। সুতরাং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ন্যায় ইহার পতন অনিবার্য্য। এই সকল দোষ পরিহার করিয়া, উন্নতিশীল নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইতেছে। আমরা ইহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ইহার কৃতকার্য্যতার উপর ভারতের অনেক মঙ্গল নির্ভর করিতেছে; কিন্তু এ গুরুতর কার্য্যের উপযোগী নেতা কই? উন্নতিশীল ব্রাহ্ম-

সম্প্রদায়ে বুদ্ধ বা গুরুগোবিন্দ কই? যে বিনয়ধর্ম্মে শাক্যসিংহ পাষাণও দ্রবীভূত করিয়াছিলেন, সে বিনয় কই? যে বিশ্বপ্রেমিকতা বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্মের বীজমন্ত্র, সে বিশ্বপ্রেমিকতা কই? ধর্ম্মভ্রাতা ও অ-ধর্ম্মভ্রাতায়, পূর্ণ সমবেদনা কই? মানব-দুঃখে বুদ্ধ হৃদয় যেরূপ কাঁদিত, ব্রাহ্ম-হৃদয় সেরূপ কাঁদে কই? যে আত্ম-বিস্মৃতিতে বুদ্ধের হৃদয় স্বর্গীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল, সে আত্মবিস্মৃতি কই? যে মাহাত্ম্যে গুরুগোবিন্দ বিদ্বেষপূর্ণ যবনদিগকে নিজ সম্প্রদায়ে আনিয়াছিলেন, সে মাহাত্ম্য কই? এই প্রকাণ্ড জাতীয় ব্রতের উদ্যাপনার নিমিত্ত ব্রাহ্মদিগকে বুদ্ধের নিকট বিনয়াদি ধর্ম্ম ও গুরু-গোবিন্দ সিংহের নিকট মাহাত্ম্য শিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে আত্মাভিমানে ও সাম্প্রদায়িকতায় পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে হইবে। এই সকল সাধনায় সিদ্ধ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা ভারতের সমীকরণ-কার্য্যসংসিদ্ধ হইবে; অন্যথা, তাঁহাদিগেরও পতন অনিবার্য্য।

ভারতের সুশিক্ষিত-সম্প্রদায়-মধ্যে আর একটী রমণীয় ধর্ম্মের বৈদ্যুতিক আভা প্রতিভাত হইয়াছে। এ ধর্ম্মের জ্যোতিঃ অতি সমুজ্জ্বল। বিদ্যুৎ-বিকাশ যেমন নয়ন ঝল্‌সিয়া দেয়, সেইরূপ ইহা নিজ প্রচণ্ড আলোকে, মানব-হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম চন্দ্র-কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধকারক, কারণ ইহা ঐহিক দুঃখযন্ত্রণার বিনিময়ে, পুণ্যবান্‌দিগের পক্ষে স্বর্গসুখ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। অনুতাপে পাপীর পক্ষেও স্বর্গভোগ বলিয়া দেয়, পরীক্ষারাজ্যে যে অনুপাতে দুঃখ ভোগ, পুরস্কার রাজ্যে সেই অনুপাতে সুখভোগের আশা প্রদান করে। কিন্তু এ কুঠোর নিষ্কাম ধর্ম্মে পুণ্যের পুরস্কারের আশা নাই। মানব-প্রেম সে ধর্ম্মের বীজমন্ত্র। নিরভিসন্ধি পূর্ব্বক মানবের উপকার সাধন সেই ধর্ম্মের একমাত্র ব্রত। নিষ্কাম ভাবে মানব-হিতে জীবন আহুতি দান এই ধর্ম্মের একমাত্র সাধনা। সেই সাধনায়,—সেই ব্রত উদ্যাপনায় এবং সেই বীজমন্ত্রের অনুধ্যানে যে বিমল আনন্দ, সেই ইহার স্বর্গ। ইহার বিপরীতাচরণে যে দুঃখ, সেই ইহার নরক। ইহাতে স্বতন্ত্র পারলৌকিক স্বর্গ নরক নাই। ইহাতে—প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ঈশ্বরমূলক

নহে; সৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, স্বর্গে সিংহাসন প্রদান করিবেন; অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে, তিনি বিরক্ত হইবেন এবং নরকের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন—এরূপ প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি জন্মাইবার চেষ্টা নাই। সৎ কার্য্য কর, আপনিই সুখী হইবে, বিমল আনন্দ লাভ করিবে; অসৎ কার্য্য কর, আপনিই দুঃখ পাইবে, আপনিই অসুখী হইবে। পাপ-পুণ্যের ভোগ ইহ লোকেই। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন কর, তৎক্ষণাৎ—কি কিছু দিন পরে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে; অনুতাপে সে দণ্ড হইতে মুক্তিলাভের আশা নাই। পরের অনিষ্ট কর, মন নরকময় হইবে, সকলে তোমাকে ঘৃণা করিবে, পাপের শাস্তি হাতে হাতে পাইবে। সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তোমার অন্তর স্বর্গময় হইয়া উঠিবে। তুমি সকলের প্রীতিভাজন হইবে। স্বর্গ-সিংহাসন তুমি এখানেই পাইবে। ঈশ্বর থাকেন ভালই, না থাকেন তাহাতেও আপত্তি নাই। সে বিষয়ে আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। আমাদের কর্ত্তব্য-সাধন করিয়া আমরা চলিয়া যাই। এই ধর্ম্ম এখনও ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয় নাই, সুতরাং ইহা দ্বারা এখন ভারতের সমীকরণ হওয়া কত দূর সম্ভব, বলিতে পারি না।

যাহা হউক, সম্পূর্ণ জাতীয় জীবনের আস্বাদ পাইবার পূর্ব্বে ভারত-বাসিগণ এক্ষণে এক-প্রকার আংশিক জাতীয় জীবন আস্বাদন করিতে পারেন। অন্যান্য সহস্র বিষয়ে ভারতের অনৈক্য থাকুক, ভারত এক্ষণে এক বিষয়ে মিলিতে শিখিতেছেন। ইংরাজ-কৃত অত্যাচারের প্রতিবাদ-বিষয়ে সমস্ত ভারতের ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাদান-সামগ্রী লইয়া ভারত-সভা ভারতবাসীদিগের অন্তরে এক আংশিক জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতি উপযুক্ত পাত্রগণের হস্তেই এই উদ্দীপনা-কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। ভারত-সভার নেতৃবৃন্দের প্রতিভা এই সাধনার সম্পূর্ণ উপযোগিনী; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে ভাষায় তাঁহারা এই উদ্দীপনা-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বৈদেশিক ভাষা। সুতরাং ভারতীয় জাতি-সাধারণ

কখন সেই উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইবেন না। এই জন্য একটী ভারতীয় সাধারণ ভাষা চাই। হিন্দী ভিন্ন আর কোন ভাষাই ভারতীয় ভাষা হইতে পারে না। কারণ হিন্দী ভারতবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কিছু কিছু বুঝিতে পারে। আর সকল ভাষা অপেক্ষা এই ভাষাই ভারতের অধিক লোকের মাতৃভাষা। সুতরাং আমরা ইচ্ছা করি, বঙ্গদেশে তাঁহারা বঙ্গভাষায়, তদ্ভিন্ন ভারতের আর সকল স্থলে হিন্দীতে এই উদ্দীপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। কারণ, জাতীয় ভাষায় উদ্দীপনা ব্যতীত জাতীয় জীবনের কোন সম্ভাবনা নাই।

ভারতের ধনিবৃন্দ! আমরা যেমন ব্রাহ্মণদিগকে নামিয়া শূদ্র ও যবনের সহিত একত্র মিশিয়া একটী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইতে বলিতেছি, সেই রূপ আপনাদিগকে ধন-গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের দীন দুঃখী প্রজাসাধারণের সহিত এক সমভূমিতে নামিয়া, তাহাদিগের দুঃখ-বিমোচনে আপনাদিগের অর্থের সদ্ব্যয় করিতে আহ্বান করিতেছি। যদি আপনারা ভারতের প্রকৃত হিতৈষী হন, যদি ভারতকে একটী প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জাতিতে পরিণত দেখিতে চান, তবে বিলাস-ভোগে অর্থব্যয় না করিয়া, কোটী কোটী দীন দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিয়া, এবং তাহাদের সুশিক্ষা বিধান করিয়া, তাহাদিগকে উচ্চে তুলিতে চেষ্টা করুন্। জানিবেন, তাহারাও এক দিন আপনাদিগকে অতি উচ্চ রাজনৈতিক শিখরে তুলিবে। এ বিশ্বব্যাপী পতনের সময় এ বিশ্বজনীন দাসত্বের সময়, আপনাদিগের এ বিলাস কেন? এ রোদনের সময়—এখন এ ধনোন্মাদ কেন?

আর ভারতের সুশিক্ষিত সম্প্রদায়! আপনাদিগকে বলি, ভারতের ভবিষ্য মঙ্গলের জন্য হিন্দুদিগকে যেমন জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের সহিত সমভূমিতে আসিতে হইবে, ধনিবৃন্দকে যেমন ধনগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া দীন দুঃখী প্রজাসাধারণের সহিত এক সহানুভূতি-সূত্রে অনুস্যূত হইতে হইবে, তেমনই আপনাদিগকেও বিদ্যাভিমান ও জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, ভারতের অশিক্ষিত কোটী নিচয়ের সহিত এক সমভূমিতে নামিয়া, তাহাদিগের অজ্ঞান-তিমির দূর করিতে হইবে,

তাহাদিগের দুরবস্থা-বিমোচনের চেষ্টা করিতে হইবে; তাহাদিগের শোক-তাপে ও দুঃখ-যন্ত্রণায় তাহাদিগকে অন্তরের সহানুভূতি দেখাইতে হইবে। জানিবেন যে, সেই অগণ্য-জনসঙ্ঘ পতিত থাকিতে ভারতের কোন আশা নাই। জানিবেন যে, সেই অগণ্য জন-সঙ্ঘকে না লইয়া আপনারা কখন উঠিতে পারিবেন না। উঠিতে চেষ্টা করিলেও, আপনাদিগকে তাহাদিগের গুরু ভারে আবার নামিয়া পড়িতে হইবে।

আপনাদিগের মস্তকে আর একটী গুরু ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। ভারতীয় নারী জাতির উদ্ধারের একমাত্র আশাস্থল আপনারা। যখন রাজনৈতিক দাসত্বের নিদারুণ যন্ত্রণা আপনারা স্বয়ং অনুভব করিতেছেন, তখন ভারতীয় জাতির অর্দ্ধাংশকে সামাজিক দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা আপনাদিগের ভাল দেখায় না। পুরাকালে ভারত-ললনার যেরূপ অবস্থা ছিল, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিকতর শোচনীয়। স্বাধীনতা ব্যতীত কখন শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-নিচয় স্ফূর্ত্তি পায় না। সে স্বাধীনতায় পুরাকালে ভারতের রমণীরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন না। তাঁহারা ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র স্বামীর অনুগমন করিতে পারিতেন। অধিক কি, তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত এক চতুষ্পাঠীতে পড়িতেও পাইতেন। উত্তর-রাম-চরিতে লিখিত আছে, বাল্মীকির আশ্রমে থাকিয়া আত্রেয়ী কুশ-লবের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতির স্বয়ংবরও স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার পরিচায়ক। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা দুর্গাবতী, ঝান্সীর রাণী প্রভৃতি বীর নারীগণের বীর্য্যবত্তার পরিচয় পাইতাম না। স্পার্টার অতি গৌরবের সময় স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল; অধিক কি, স্ত্রী-পুরুষ প্রকাশ্যস্থলে পরস্পর মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেও লজ্জা বোধ করিতেন না। স্পার্টার রমণীর স্বাধীনতা ছিল বলিয়াই, স্পার্টান্ রমণী বীরপ্রসবিনী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা যে শুদ্ধ বীর সন্তান প্রসব করিতেন এরূপ নহে, বীর পুত্র-দিগকে উদ্দীপনা-বাক্যে রণোৎসাহে মাতাইতেন। স্পার্টান্ রমণীরা যুদ্ধ-যাত্রাকালে প্রাণসম প্রিয়তম পুত্রের হস্তে ঢাল দিয়া, তাহাকে

অবাধে বলিতেন—"যাও পুত্র! যাও। হয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া, এই ঢাল হাতে জয়োৎসাহে জননীর চরণ বন্দন করিও, অথবা যুদ্ধে হত হইয়া ঢালোপরি জননীর নিকট আনীত হইও।" জননীর মুখোচ্চারিত এ উদ্দীপনা-বাক্যে কোন্ পুত্রের হৃদয়ে বীর্য্য-বহ্নি সন্ধুক্ষিত না হয়? যখন রাজবারায় স্ত্রীস্বাধীতা ছিল, তখন রাজপুত-রমণীরাও এক দিন এইরূপ উদ্দীপনা-বাক্যে পুত্রগণের ভস্মাচ্ছাদিত বীর্য্য-বহ্নি প্রজ্বালিত করিতেন। সে সময় অনেক রাজপুত রমণীর অসি অনেক যবনকে শমন-সদনে প্রেরণ করে। কিন্তু আজ ভারত-ললনার কি দশা? আজ ভারত-সন্তান অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে চাহিলেই ভারত জননী বাধা দিতে উদ্যত,—কেন না অন্তঃপুরের বাহিরের খবর তিনি কিছু জানেন না, সুতরাং কোন্ প্রাণে তিনি প্রাণসম পুত্রকে অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করেন?

ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান উন্নতির অনেকটা কারণ স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতার সহচরী। স্ত্রীস্বাধীনতা ব্যতীত স্ত্রীশিক্ষা পূর্ণ হইতে পারে না। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ব্যতীত যেমন পূর্ণ শিক্ষা হয় না, সেইরূপ সাহস ও বীর্য্যবত্তাও স্ফূর্ত্তি পায় না। আমরা ইউরোপীয় ইতিহাসে এলিজেবেথ্, ক্যাথেরাইন্, মাডেম্ রোলাণ্ড, এন্টয়নেটি, জোসেফাইন্ প্রভৃতি যে সকল অদ্ভুত রমণীর ইতিবৃত্ত পাঠ করি, তাঁহারা সকলেই স্ত্রীস্বাধীনতার ফল। কয় জন রাজা এলিজেবথ্ ও ক্যাথেরাইনের ন্যায় রাজসিংহাসন সমুজ্জ্বল করিয়াছেন? ফরাশি বিপ্লবকালে মাডেম্ রোলাণ্ড জিরণ্ডিষ্ট দলের জীবন-স্বরূপিণী ছিলেন, এবং এন্টয়নেটী রাজতান্ত্রিক দলের একমাত্র নেত্রী ছিলেন। জোসেফাইন্ বীরচূড়ামণি নেপোলিয়নের সমর-বিষয়িণী প্রতিভার জনয়িত্রী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যে ইতালীক্ষেত্রে নেপোলিয়ন্ অসংখ্য বিজয় লাভ করেন, সেই সকল রণক্ষেত্রে জোসেফাইন্ নেপোলিয়নের পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিতেন। গারিবল্ডী-পত্নীও জাতীয় সমরাঙ্গণে অশ্বপৃষ্ঠে সতত স্বামি-সহচারিণী থাকিতেন।

ভারতবাসী পতিত আর্য্য! পতিত অনার্য্য? যদি ভারতকে আবার উন্নতির উচ্চ-শিখরে তুলিতে চাও, যদি আবার ভারত-জননীকে বীর-প্রসবিনী দেখিতে চাও, তবে অগ্রে ভারত-ললনাকে স্বাধীনতা প্রদান কর, স্বাধীনতা প্রদান করিয়া, জ্ঞানালোকে তাঁহার অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন অন্তরকে সমুজ্জ্বলিত কর। দেখিবে, এই সঞ্জীবনী-শক্তি-প্রভাবে ভারতে নব জীবন সঞ্চারিত হইবে। বীর-জননীর কুক্ষি হইতে বীর সন্তান প্রসূত হইয়া, ভারতগগনে অপূর্ব্ব সৌভাগ্য-রবি সমুদিত করিবে; এবং অসংখ্য মাডেম্ রোলাণ্ড, অসংখ্য জোসেফাইন্, অসংখ্য এলিজেবেথ্—ভারতের তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে অসংখ্য-পূর্ণচন্দ্র-রূপে উদিত হইবে।

ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ভারতের আত্মরক্ষিণী শক্তি! এ ভীষণ বিপৎ-কালে আমাদিগকে রক্ষা কর,—ত্বদাশ্রিত ছিন্ন ভিন্ন জাতি-নিচয়কে পরস্পর-বিদ্বেষ-শূন্য একটী প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত কর; এ ঘোর দাসত্বের সময় আমাদিগের মন হইতে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতা, সর্ব্বপ্রকার জাত্যভিমান, এবং সর্ব্বপ্রকার আত্মাভিমান বিদূরিত কর; সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়কে এক সমবেদনা-সূত্রে একরূপে অনুস্যূত কর, যেন একটী হৃদয়ে বেদনা লাগিলে, সকল হৃদয় মর্ম্মপীড়িত হয়; আরাধ্য গুরুগোবিন্দ সিংহকে যে মহান্ জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিলে, আমাদিগের অন্তরেও সেই মহান্ জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা কর;—সমস্ত শিখ-জাতিকে, যে ভ্রাতৃত্বভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলে, সমস্ত ভারত-বাসীকে আজ সেই ভ্রাতৃত্বভাবে অনুপ্রাণিত কর। এই মহান্ জাতীয় ভাবের অনুপ্রবেশে, এই উদার ভ্রাতৃত্বভাবের সঞ্চারে, ব্রাহ্মণ—শূদ্রের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিবে; যবন—হিন্দুর প্রতি, এবং হিন্দু—যবনের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিবে; ধনী—ধনগর্ব্ব, ও জ্ঞানী জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগ করিবে; উচ্চশ্রেণী—নিম্নশ্রেণীর প্রতি চিরলালিত ঘৃণার ভার পরিত্যাগ করিবে। এই সঞ্জীবনী-শক্তি-প্রভাবে মৃতপ্রায় ভারতে আবার নব জীবন সঞ্চারিত হইবে। ভারতের এই শ্মশানভস্ম হইতেই আবার রণবীর, জ্ঞানবীর

ও ধনবীর—অগণ্য সংখ্যায় সমুদ্ভূত হইবে। এই জাতীয় জীবনের অরুণোদয়েই ভারতের ওয়াসিংটন্, ভারতের গ্যারিবল্ডি, ভারতের কাবুর ভারত ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবেন!

যখন ইতালী পড়িয়া দুই বার উঠিয়াছে, গ্রীস পড়িয়া আবার উঠিয়াছে, দাস আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছে, ঘৃণিত জাপান ধূঁইয়া উঠিতেছে, নিপীড়িত আয়র্লণ্ড মাথা তুলিয়াছে,—তখন কার সাধ্য বলে, পতিত ভারত আর উঠিবে না, জগতের গৌরব ভারত আর বাঁচিবে না?

বৈদেশিক সংমিশ্রণ ও তাহার উপকারিতা।

হিন্দুসমাজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া একটী নূতন আবর্ত্তনে আলোড়িত হইতেছে। বৈদেশিক সংমিশ্রণে হিন্দুসমাজের বন্ধন শিথিলিত হওয়ায়, ইহাতে বিবিধ সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। মনুর সময় হইতে ইংরাজদিগের আগমন পর্য্যন্ত যুগসহস্র ব্যাপিয়া যে হিন্দুসমাজ অচলমালার ন্যায় অটল ভাবে স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান ছিল, মুসলমান রাজগণের ভীষণ অত্যাচারেও যে হিন্দুসমাজ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই—বরং অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছিল, আজ পশ্চাত্য সভ্যতার মোহিনী-শক্তি-প্রভাবে, সেই হিন্দুসমাজে সর্ব্বাঙ্গীন বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কোন দেশ ম্যালেরিয়াদি দোষে দুষ্ট হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন প্রচণ্ড ঝটিকা বা জলপ্লাবনাদি উপস্থিত হইয়া সে দেশকে আলোড়িত করে, এবং সেই আলোড়নে যেমন সেই দেশের ম্যালেরিয়াদি দোষ কাটিয়া যায়, সেইরূপ হিন্দু সমাজ বহুদিন জড়পিণ্ডের মত থাকিয়া ক্রমেই জীবনী শক্তি হারাইতেছিল, এমন সময় দৈবানুগ্রহে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ইহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যেমন ঝটিকা বা জলপ্লাবনাদির আনুসঙ্গিক নৈমিত্তিক অনিষ্টাপাত

অপরিহার্য্য, সেইরূপ এই সংঘর্ষের আনুষঙ্গিক অব্যবহিত নৈমিত্তিক অমঙ্গল-নিচয়ও দুর্মোচ্য; কিন্তু ঝটিকা বা জলপ্লাবনাদির ব্যবহিত ফল যেরূপ শুভদ, এইরূপ সংঘর্ষেরও পরিণাম সেইরূপ শুভপ্রদ।

হিন্দুসমাজ একণে যে কয়টী সমাজ-বিপ্লবে আলোড়িত হইতেছে, বিলাত-গমন তাহার অন্যতম। বহু কাল ধরিয়া ভারত-বহিশ্চর জাতি-নিচয়ের সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের কোন সংমিশ্রণ না হওয়ায়, তাঁহারা এত দিন জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা সভ্যসমাজে এক সময়ে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এখন সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন; এবং যে সকল জাতি পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় সভ্য জাতি বলিয়াই গণিত হইত না, এখন তাহারা সভ্যতা-শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে বড় ছিলাম বলিয়া অভিমান করিয়া এখন যাহারা বড় হইয়াছে, তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিলে, আমাদিগের ভাবী উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত হইবে। আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যাহাদিগকে যবন বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এক সময়ে যাহাদিগকে অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া মনে করিতেন, তাহারা বস্তুতঃ তখন ঘৃণার্হ ও অস্পৃশ্যই ছিল। কিন্তু এখন সে তুলামান আবর্ত্তিত হইয়াছে। একণে পরিচ্ছদ, আহার, বাসের পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য্য, বীর্য্য——সকল বিষয়েই সেই যবন আমাদিগের শ্রেষ্ঠ। এক সময়ে আমরা যেমন তাঁহাদিগকে 'অসভ্য বর্ব্বর' বলিয়া ঘৃণা করিতাম, এখন তাহারাও তেমনই আমাদিগকে 'অসভ্য নিগার' বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। আমরা যদি বস্তুতঃ বুঝিয়া থাকি যে, আমরা এখন বস্তুতঃই তাহাদিগের অপেক্ষা সকল বিষয়েই হীন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা হইলে অভিমান-ভরে তাহাদিগ হইতে দূরে থাকিলে আমাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। গুণের অনুকরণে কোন দোষ নাই। আমাদিগের যখন ভাল সময় ছিল, তখন তাহারা আমাদিগের অনুকরণ করিয়াছে, আমাদিগের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা পাইয়াছে; এখন তাহাদিগের উন্নতির ও আমাদিগের অবনতির সময়। এখন আমরা তাহাদিগের নিকট যাহা ভাল পাইব, তাহা

শিখিব, তাহাদিগের সমস্ত গুণের অনুকরণ করিব—তাহাতে দোষ কি? যে এক সময় অধমর্ণ ছিল, তাহার কি চিরকালই অধমর্ণ থাকিতে হইবে; এবং যে এক সময় উত্তমর্ণ ছিল, সে কি চির কালই উত্তমর্ণ থাকিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। প্রকৃতি কাহারও অদৃষ্টে চির কাল দুঃখ বা কাহারও অদৃষ্টে চির কাল সুখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন নাই। প্রকৃতির নিয়মানুসারে জগতে সুখ দুঃখ নিয়ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে*। সুতরাং, সভ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগের সভ্যতা ও জ্ঞান-শিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। বৃথা অভিমান-ভরে ইহা হইতে বিরত থাকিলে, আমাদিগের সৌভাগ্য-তপন সমুদিত হইতে অনেক বিলম্ব হইবে। যাঁহারা আপনারা অভিমান-ভরে রহিবেন, বা অভিমান ত্যাগী ব্যক্তির উন্নতিশীল গতির অন্তরায় হইবেন, তাঁহারা অন্তরে দেশহিতৈষী হইলেও কার্য্যতঃ দেশের পরম শত্রু।

আধুনিক সভ্য ইউরোপের নিকট সভ্যতা ও জ্ঞান-শিক্ষা করিতে হইলে, সভ্যতা ও জ্ঞানের রঙ্গভূমি ইউরোপ-ক্ষেত্রে গমন করা একান্ত প্রয়োজন। অভিনয়ের বর্ণনা শুনিয়া যেমন অভিনয় দর্শনের তৃপ্তি লাভ করা অসম্ভব, শুদ্ধ পুস্তক পড়িয়া সেই জীবন্ত সভ্যতা ও জ্ঞানের অনুভূতি করা সেইরূপ অসম্ভব। যেমন শবচ্ছেদ না করিয়া শারীর বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র, সেইরূপ সভ্য সমাজের আভ্যন্তরীণ চিত্র স্বচক্ষে না দেখিয়া সভ্যতার অনুকরণ-চেষ্টা উপহাসাস্পদ মাত্র। আমরা এই জন্যই ইউরোপ-যাত্রার বিশেষ পক্ষপাতী। বিশেষতঃ বিলাত গমনে আমাদিগের দ্বিবিধ উপকার আছে। এক দিকে সভ্যতা ও জ্ঞান-লাভ, অন্য দিকে ধন, মান ও পদলাভ। এ দ্বিবিধ উপকারই আমরা এখানে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে ও সহজে লাভ করিতে পারি না।

এই সকল উপকার আছে বলিয়াই, অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া পশ্চিমাভি-

---

* চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। মহাভারত।

মুখে প্রবল জন-স্রোত বহিয়াছে। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় ক্রমে ক্রমে নানা উদ্দেশে বিলাত গমন করিয়া তথা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবং কতকগুলি এখনও তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, জঙ্গবাহাদুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয় জন ভিন্ন আর প্রায় সকলেরই বিলাত-গমনের উদ্দেশ্য বিদ্যোপার্জ্জন বা বাণিজ্য। আমাদিগের বিশ্বাস, যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিলোপ না হয়, তাহা হইলে, এই স্রোত দিন দিন অধিকতর প্রবল হইবে। এ স্রোতের গতি বা বেগ-নিবারণ করা হিন্দু-সমাজের এক্ষণে অসাধ্য।

কেন অসাধ্য, তাহা আমরা বলিতেছি। উচ্চ পদে আরোহণ করার ইচ্ছা ও তদনুষ্ঠান-চেষ্টা মানব-জাতির হৃদয়ের একটী বলবতী স্বাভাবিকী বৃত্তি। সামান্য গার্হস্থ ভৃত্য হইতে সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেই এই প্রবল বৃত্তির দাস। বস্তুতঃ পরিশ্রমের বা মস্তিষ্ক-পরিচালনের বিনিময়ে যখন বেতন লইতেই হইল, তখন যাহাতে অধিক বেতন পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সেইরূপ বাণিজ্য-স্থলেও বলিতে পারা যায়, যে যখন বাণিজ্য করিয়াই অর্থোপার্জ্জন করিতে হইল, তখন যাহাতে সেই বাণিজ্যের সর্ব্বতোভাবে শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। যদি তাহাই কর্ত্তব্য স্থির হইল, তাহা হইলে, কি উপায়ে অধিক বেতন লাভ করা যাইতে পারে, এবং কি উপায়েই বা বাণিজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করা যাইতে পারে, সেই উপায়ের উদ্ভাবন ও অনুবর্ত্তন কখন অকর্ত্তব্য বা নীতিবিগর্হিত হইতে পারে না। বিলাত-গমন সর্ব্বোচ্চ বেতন-প্রাপ্তির ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের প্রধান উপায়, সুতরাং বিলাত গমন কখন অকর্ত্তব্য বা নীতি-বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিলাতগমন যেমন উচ্চ পদ ও উচ্চ বেতন-প্রাপ্তির প্রধান উপায়, ইহা সভ্যতা-শিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের সেইরূপ প্রধান সোপান। আমরা এখানে যে সকল অধ্যাপকের নিকট ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী গণিত, ইংরাজী বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়ন করি,

বিলাতে গমন করিলে, সেই অধ্যাপকদিগের অধ্যাপকের নিকট সেই সেই বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, আমরা এখানে যাঁহাদিগের রচিত পুস্তক পাঠ করি, তাঁহারাই ব্রিটনে সেই সেই বিষয়ের অধ্যাপক। সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তা অধ্যাপকের নিকট গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় পড়িয়া যে সুখ ও যে উপকার, অপরের নিকট তাহা পড়িয়া কখনই সে সুখ ও সে উপকার হইতে পারে না। গ্রন্থকর্ত্তা অধ্যাপক আপনার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যেরূপ বিশদরূপে বুঝাইতে পারিবেন, অপরে কখন সেরূপ পারিবেন না। এই জন্য যেখানে যে বিষয়ের উৎপত্তি, সেই খানেই নানাদেশের ছাত্রগণের সমাগম। নবদ্বীপে আধুনিক স্মৃতি ও দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি ও আলোচনা বলিয়াই নানা দেশ হইতে তত্তদ্বিষয়ের অধ্যয়নাভিলাষী ছাত্রগণ আসিয়া তথায় সেই সেই শাস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধবিদ্যায় দেবতারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়াই অর্জ্জুনাদি অমরাবতীতে অস্ত্রশিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। এই রীতি চির-প্রচলিত, স্বভাব-সিদ্ধ ও শুভপ্রদ। ইহার ব্যতিক্রমে বরং অমঙ্গলেরই সম্ভাবনা। যেমন এক ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইতে পারেন না, সেইরূপ এক জাতিও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। বিশেষ বিশেষ জাতির বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশিষ্ট পারদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়। পরের যাহা ভাল, তাহা শিখিয়া গৃহে আনিবে, আর তোমার যাহা ভাল, তাহাতে অপরকে শিক্ষা দিবে—এইরূপ উদার নীতি ব্যতিরেকে জগতের উন্নতির সামঞ্জস্য রাখিতে পারা যায় না। এই উদার নীতির অভাবেই জগতে জ্ঞান ও সভ্যতার এত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই উদার নীতির অভাবই ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের পতনের অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা যে অতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন, এবং অনেক বিষয়েই তাঁহারা যে মৌলিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন —ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অতিশয় জ্ঞান-গর্ব্বিত ছিলেন। তাঁহারা নিজে যাহা

উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা আর কিছু ভাল হইতে পারে এরূপ সংস্কার তাঁহাদিগের ছিল না। তাঁহারা আপনাদিগের দ্রব্যজাত লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু মানুষ সর্ব্বজ্ঞ নহে। সুতরাং বৈদেশিক আলোক বিরহে তাঁহাদিগের উন্নতি ক্রমে স্থিতিশীল হইয়া উঠিল। ইহা একটী নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্গে উঠিয়া আর উঠিতে পারিল না। তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইলেন যে, উন্নতি-শৈলের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শৃঙ্গ আর নাই। তাঁহাদিগের অগ্রগামিণী গতি নিবৃত্ত হইল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের পতনও আরম্ভ হইল। কারণ, প্রকৃতির নিয়মে কোন পদার্থই চির দিন এক ভাবে বা এক স্থানে থাকিতে পারে না। হয় ইহা উঠিবে, নয় নামিবে, হয় অগ্রসর হইবে, নয় পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। জীবনের প্রথম নিয়ম গতি। যেমন সর্ব্বপ্রকার দৈহিক গতিরোধ হইলেই দেহীর মৃত্যু, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার সামাজিক গতিরোধ হইলেই সমাজের মৃত্যু। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উন্নতি-শৈলের যে শৃঙ্গ উঠিয়াছিলেন, আমরা ধীরে ধীরে সেই শৃঙ্গের প্রায় পাদদেশে আসিয়া পড়িতেছি। সেই অধোগতির ধীর বেগে এখনও আমাদিগের জাতীয় দেহে সঞ্জীবনী শক্তি আছে। এখনও উঠিতে চেষ্টা করিলে, আমরা উঠিতে পারির। কিন্তু যখন সেই শৃঙ্গের চরণ-তলে পড়িয়া আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার গতিরোধ হইয়া সঞ্জীবনী শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইবে, তখন আর কোন আশা থাকিবে না, তখন আমাদিগের জাতীয় মৃত্যু অপরিহার্য্য। সেই অবশ্যম্ভাবী জাতীয় মৃত্যুর দিন দূর প্রসারিত করিতে হইলে, আমাদিগকে উঠিতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে আমরা উঠিতে পারি? বহুদিনব্যাপি-অবনমনে আমাদিগের জাতীয় অঙ্গ স্ফূর্ত্তি-বিহীন হইয়াছে। এ অবস্থায় অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া উঠিতে গেলে, অভ্যুত্থান-স্পৃহা হয় ত ফলবতী না হইতে পারে; অথবা যদি ফলবতী হয়, তবে অনেক বিলম্ব হইতে পারে। এ দুর্ব্বল শরীরে প্রবলতর বৈদেশিক জাতির হস্তাবলম্ব একান্ত প্রয়োজন, প্রয়োজন বলিয়াই ঐশী শক্তি-প্রভাবে অথবা প্রাকৃতিক-নিয়মানুসারে ইংরাজ ভারতে

ভারতীয় ইংরাজ আমাদিগকে কথঞ্চিৎ করাবলম্ব প্রদান করিয়াছেন বটে, আমাদিগকে জাতীয় পতনাবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগকে এখনও পূর্ণ জাতীয় জীবনের সুখে সুখী করিতে পারেন নাই। সে দেব-দুর্লভ সুখ কিরূপ, আমরা ভারতীয় ইংরাজের সংসর্গে আসিয়া জানিতে পারি না। জাতীয় জীবনের চিরদোলা শ্বেতদ্বীপে গমন না করিলে সে সুখের পূর্ণ প্রতিবিম্ব আমরা দেখিতে পাই না। জাতীয় জীবনের জ্বলন্ত ভাব আমরা ভারতে কখনই উপলব্ধি করিতে পারি না। জাতীয় কার্য্যে জীবন্ত ভাব এ পতিত ভারতে থাকিয়া আমাদিগের দেখিবার সম্ভাবনা নাই। আজ্ গ্লাড্‌ষ্টোন বক্তৃতা করিবেন, পঞ্চাশৎ সহস্র লোক হাইড্‌পার্কে সমবেত; আজ্ ব্রাডল্ পার্লেমেণ্ট হইতে তাড়িত, বিংশ সহস্র লোক পার্লেমেণ্টের দ্বারে দণ্ডায়মান—জাতীয় জীবনের এ মূর্ত্তি যে কখন দেখে নাই, তাহার অন্তরে জাতীয় জীবনের জীবন্ত ভাব কিরূপে আবির্ভূত হইবে?

সুতরাং আমাদিগকে উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে হইলে, কোন উন্নতিশীল জাতির জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ চিত্র স্বচক্ষে দেখিতে হইবে। কোন্ কোন্ নৈতিক ও সামাজিক উপাদান সেই উন্নতির ভিত্তিভূমি তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়া ভারতীয় সমাজে তাহার বীজ বপন করিতে হইবে। সেই বীজ যখন বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে, তখনই আমাদিগের জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ হইবে। ইহা না করিয়া যাঁহারা গৃহে বসিয়া সমাজশাসন-বহির্ভূত দুই একটী ভারতীয় ইংরাজ-গৃহের চিত্র দেখিয়া সমস্ত ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তি-ভূমি দূষিত মনে করিয়া আপনার অন্তরে ভ্রান্ত জাতীয় গৌরব পরিপোষিত করেন, তাঁহাদিগের মত পাগল আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে——যে জাতির সমাজ ও নীতি দূষিত, সে জাতি কখনই সভ্যতা ও উন্নতি-শৈলের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিতে পারে না। সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষের সহিত সভ্যতা ও উন্নতির অব্যভিচারী কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ। ইতিহাস ইহার

প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সুতরাং সভ্যতা ও উন্নতির রঙ্গভূমি ইউরোপ বা ব্রিটন যে নৈতিক ও সামাজিক উৎকর্ষে আধুনিক ভারতের নিম্নে অবস্থিত, এ কথা অশ্রদ্ধেয় ও অপ্রামাণ্য। কখন যে ভারতে নৈতিক ও সামাজিক উৎকর্ষ ছিল না, এ কথা আমরা বলি না। প্রাচীন ভারতে সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা অচলা; কিন্তু বর্ত্তমান পতিত ভারতে সে উৎকর্ষানলের কেবল ভস্ম-রাশি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতে বসিয়া শুদ্ধ আমাদিগের অতীত গৌরবের জন্য অশ্রুবিস-র্জ্জন করা অপেক্ষা, পাশ্চাত্য-জাতি-নিচয়ের গৌরব-তপনের প্রখর রশ্মি-মালায় উদ্ভাসিত হওয়া সর্ব্বথা শ্রেয়। সেই রশ্মি-মালার সঞ্জীবনী শক্তি-প্রভাবে আমাদিগের জাতীয় জীবন নব জীবন ধারণ করিবে। স্বাধীন চীন, স্বাধীন জাপান—প্রাচ্য ফ্রান্স, প্রাচ্য ব্রিটন—অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলনার্থ নহে, উচ্চতর সভ্যতা ও জ্ঞানের সংস্রবে আসিয়া অধিকতর সভ্যতা ও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, বর্ষে বর্ষে কত শত যুবককে ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রেরণ করিতেছেন। যখন ভারত —প্রাচ্য ইতালী—স্বাধীন ছিল, তখন ভারতের বাণিজ্য-পোত সুদূর প্রাচ্যে, সুদূর প্রতীচ্যে ভারতের বস্তুরাশি ছড়াইয়া তৎপরিবর্ত্তে নানা দেশের পণ্যজাত লইয়া গৃহভাণ্ডার পরিপূরিত করিত। তখন ভার-তের স্বার্থবাহী বণিক্‌নিচয় পদব্রজে ব্যাকট্রিয়, তাতার, কাস্‌পিয়ান, কৃষ্ণহ্রদ অতিক্রম করিয়া গ্রীস্, ইতালী, ভিনিস, লম্বার্ডী—সর্ব্বত্র ভারতের পণ্যজাত লইয়া যাইত। সে লক্ষ্মীশ্রীর সময় ভারতে সমুদ্র-যাত্রা বা বৈদেশিক সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু আজ্ পতিত ভারতের সকলই সার্গল।

যদি বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতাতে ভারত ইউরোপের সমকক্ষ হইত, তাহা হইলেও, ইউরোপের সহিত সংমিশ্রণে ভারতের সবিশেষ উপ-কার হইত। নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া নানা জাতির রীতি নীতি ও সামাজিক আচার ব্যবহার দেখিলে, মানসিক জড়তা অপনীত এবং জাতীয় কুসংস্কার বিদূরিত হয়। এই জন্য ব্রিটন ও অন্যান্য ইউ-

রোপীয় জাতির মধ্যে এরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, ছাত্রদিগকে দেশ-পর্য্যটন করিতে হইবে। দেশ-পর্য্যটন বিনা শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিবে। ব্রিটনের ছাত্রেরা ফেলোশিপ লইয়া, ছয় মাস বা এক বৎসর কাল ইউরোপ মহাদেশ পর্য্যটন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ চিত্র স্বচক্ষে দেখিয়া বেড়ান, এবং যত দূর সাধ্য তাহাদিগের ভাষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিখিয়া লন। যাঁহারা ফেলোশিপ পান না, অথচ যাঁহাদিগের পিতা মাতার অবস্থা ভাল, তাঁহারাও পিতৃ-মাতৃ-ব্যয়ে শিক্ষা সমাপ্তির জন্য ইউরোপ যাত্রা করেন। এইরূপ ইউরোপের ছাত্রেরাও শিক্ষা-সমাপ্তির জন্য ব্রিটন ও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন ও অবস্থিতি করিয়া থাকেন। কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গে কি হইয়া থাকে? যাঁহারা প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-প্রতিষ্ঠাপিত ফেলোশিপ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলবতী অর্থার্জ্জন-স্পৃহার দাস হইয়া অন্যের কষ্টার্জ্জিত ধনে আপনাদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি না করিয়া আপনাদিগের ব্যবহার-ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধন করিয়া লন। যে দিন ফেলোশিপ পান, সেই দিন হইতেই তাঁহাদিগের সমস্ত উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হয়। যাঁহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাঁহারা প্রায়ই বিদ্যা-মন্দিরের উচ্চতম সোপানে উঠিতে পারেন না; যাঁহারা সক্ষম হন, তাঁহারা প্রায়ই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিলাসিতার মোহন ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের জ্ঞান পিপাসা উপাধি-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। সুতরাং যাঁহারা আশা করেন যে, ধনীর তনয় বিলাত গমন করিয়া, বিজেত্রী জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সমরে জয়ী হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহাদিগের কর-কবল হইতে পদ-মর্য্যাদা কাড়িয়া লইবে, এবং আমাদিগের ললাট-ঘর্ম্মার্জ্জিত ধনের অন্ততঃ কিয়দংশ স্বদেশে পরিরক্ষিত করিবে, তাঁহাদিগকে আমরা নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করি। উচ্চশ্রেণী দ্বারা কখনই কোন দেশের কোন বিপ্লব সাধিত হয় নাই। আজ উচ্চশ্রেণী নামিয়া ভারতের এই প্রকাণ্ড বিপ্লব সংসিদ্ধ করিবেন, ইহা কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না। যদি এ বিপ্লব

তাহারও দ্বারা সংসাধিত হয়, ত মধ্য বা নিম্নশ্রেণী দ্বারাই হইবে।

অনেকে এই রূপ তর্ক তুলিযা থাকেন যে, যখন এ দেশে থাকিয়াও জ্ঞান ও অর্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, তখন এত ব্যয় করিয়া ও এত ক্ষতি স্বীকার করিয়া, বিলাতে যাইবার প্রয়োজন কি? তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই যে, বিলাত যাওয়া শুদ্ধ জ্ঞান-পিপাসা বা অর্জ্জনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, আমাদিগের বিজেতা ইংরাজের সমান পদ ও সমান ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবারও জন্য। বিজেত্রী জাতির অনৌদার্য্য দোষে আমরা এ দেশে থাকিয়া, কখন ইংরাজের সমান পদ ও সমান ক্ষমতা পাইতে পারি না। এক জন বারিষ্টার অপেক্ষা এক জন হাইকোর্টের উকিল অধিক অর্থ পাইতে পারেন, কিন্তু বারিষ্টারের ক্ষমতা ও স্বত্ব, হাইকোর্টের উকিলের ক্ষমতা ও স্বত্ব অপেক্ষা অনেক অধিক। সুশিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালী বারিষ্টারের দল বৃদ্ধি দেখিয়া ভীত ও দুঃখিত হন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের একমাত্র বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালী বারিষ্টারের সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত যদি সাহেব বারিষ্টারের সংখ্যা হ্রাস হয়, তাহা হইলে, আমাদিগের সমূহ মঙ্গল। ভারতের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের পশ্চিম বাহী স্রোত অন্ততঃ কিঞ্চিৎ রুদ্ধ হইলেও আমাদিগের যথেষ্ট লাভ। যদি বলেন, ইহাতে সাহেব বারিষ্টারের সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, তাহা হইলে, সাহেব বারিষ্টারগণের আয় কমিয়া গিয়াছে, অথবা বাঙ্গালী বারিষ্টারগণ অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছেন—আমাদিগকে অগত্যা এই দুই বিকল্পের অন্যতর স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা যত দূর জানি, তাহাতে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, কোন বাঙ্গালী বারিষ্টারকেই আজ অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই। তাঁহাদিগের যেরূপ আশা, সকলে তদনুরূপ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু সকলেরই আয় সাধারণ উকিলের অপেক্ষা অনেক অধিক। আর আমরা যদি স্বজাতি-পোষক হইতাম, যদি মকদ্দমা উপস্থিত হইলেই ইংরাজ বারিষ্টারের শরনাগত না হইতাম, তাহা হইলে, কি অঙ্গুলিমাত্রে গণ-

নীয় কয়জনমাত্র বাঙ্গালী বারিষ্টারের অবস্থা সাধারণ সাহেব বারিষ্টারের অপেক্ষা হীন হইত? তাহা হইলে কি ভারতের অর্থ নদীস্রোতের ন্যায় অবিরাম শ্বেতসাগরে গিয়া মিশিত? যাহাই হউক, আমাদিগকে পূর্ব্ব কল্প স্বীকার করিতেই হইতেছে যে, বাঙ্গালী বারিষ্টারগণের আবির্ভাবে সাহেব বারিষ্টারগণের আয় কমিয়া ভারতের অর্থ অন্ততঃ কিছু পরিমাণে ভারতে রহিয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, বারিষ্টার হইবার জন্য দশ বার হাজার টাকা নষ্ট না করিয়া, তাহাতে একটা ব্যবসায় করিলে, অধিক লাভ হইতে পারে। অনেকে উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধেও এইরূপ আপত্তি তুলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, একটী পুত্রকে এম্ এ, বি এল্ পর্য্যন্ত পড়াইতে যে ব্যয় হয়, আজ কাল সে ব্যয়ের প্রতিফল হয় না। এই দুই স্থলেই আমাদিগের বক্তব্য এই যে, যত দিন আমরা এই উভয় দলের আয়ের নির্ম্মিত গড় তালিকা গ্রহণ না করিতেছি, তত দিন এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলিবার আমাদিগের অধিকার নাই। যদি বাস্তবিকই ইহা হইত, তাহা হইলে, এই দীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও বিলাত যাত্রার স্রোত দিন দিন বৃদ্ধি না পাইয়া নিশ্চয়ই হ্রাস প্রাপ্ত হইত। আমরা যত দূর জানি, তাহাতে আমাদিগের সংস্কার যে, এক জন গ্রাজুয়েট কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার সময় প্রথম দুই এক বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহার পর তাঁহাদিগের আয় তাঁহাদিগের উপর ব্যয়িত মূল ধনের বাণিজ্য নিয়োগোৎপন্ন লাভ অপেক্ষা অনেক পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। বাঙ্গালী বারিষ্টারগণ সাধারণতঃ অতিশয় অপরিমিতব্যয়ী। এই জন্য অনেক সময় তাঁহারা পর্য্যাপ্ত আয় সত্ত্বেও কষ্ট পাইয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহাদিগের সাধারণ গড় আয় বোধ হয় পাঁচ শত টাকার ন্যূন হইবে না। দুই এক জনের আয় মাসিক দশ সহস্র মুদ্রা শুনিতে পাওয়া যায়। এই ত গেল অর্থসম্বন্ধে। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালী বারিষ্টারগণের যে মর্য্যাদা, সে সত্ত্ব—বাঙ্গালী জজ্ ভিন্ন আর কোন বাঙ্গালার সেরূপ স্বত্ব নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দশ হাজার টাকার মূল ধন লইয়া ব্যব-

সন্ন করা অপেক্ষা সেই টাকায় ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে পারিলে, অধিক অর্থ, অধিক মান, অধিক মর্য্যাদা ও অধিক ক্ষমতা পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা সিবিল সার্ব্বিস্ বা মেডিকেল সার্ব্বিসের জন্য বিলাতে গমন করেন, তাঁহাদিগের ব্যয়, ব্যারিষ্টার হইবার জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধেক। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যে যোগ দিবার দিন হইতেই তাঁহাদিগের আয় তাঁহাদিগের প্রতি ব্যয়িত মূল ধনের সম্ভাব্য বাণিজ্য-লভ্য আয় অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক হইয়া পড়ে। ক্রমশই তাঁহাদিগের আয় বাড়িতে থাকে। এ দিকে তাঁহাদিগের মান, ক্ষমতা, স্বত্ব—এ দেশে পরীক্ষোত্তীর্ণ সুশিক্ষিতগণের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া থাকে। যে সকল উচ্চপদ একমাত্র বিজেতৃ জাতির উপভোগ্য, তাহাতে তাঁহারা অধিষ্ঠিত হওয়ায়, বিজেতৃ-গণের সহিত তাঁহাদিগের বৈষম্য প্রায় তিরোহিত হয়। এই রূপে সমাজের কিয়দংশও বিজেতৃ জাতির সমকক্ষ হওয়ায়, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গসমাজ অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও দিন দিন অগ্রসর হইতেছে, এবং বিন্দুপরিমাণেও দিন দিন উন্নতি শৈলে উঠিতেছে। এ শুভপ্রদ সামাজিক-স্বাস্থ্যদ অগ্র গমনকে কেহ কেহ কি বলিয়া রোগ-পর্য্যায়ভুক্ত করেন, আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।

সুশিক্ষিত দলের কেহ কেহ ছেলেপিলের বিলাত যাওয়া সমাজ-শাসন দ্বারা নিরুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা বিংশতি বা তদূর্দ্ধ বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তির বিলাত-গমন অনুমোদন করেন, কিন্তু তন্ন্যূনবর্ষ বয়স্ক বালকের বিলাত যাওয়া রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং কঠোর সামাজিক দণ্ডবিধি দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা স্বাধীনভাবে বিলাত গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিংশতিবর্ষ বয়সের ন্যূনবয়স্ক ত কাহাকেও দেখিতে পাই না। সুতরাং যখন অপরাধী নাই, তখন কঠোর দণ্ডবিধির অবতারণা করিতে সমাজকে অনুরোধ কেন? যাহাতে সমাজের প্রকৃত উন্নতি, সেই সৎসাহস ও সাধু উদ্যমকে সামাজিক রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ

কেন? বিজেত্রী জাতির নিকট আপনাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব কাড়িয়া লইবার যাহা একমাত্র উপায়, সে পথে নূতন কণ্টক-রোপণ করিবার চেষ্টা কেন?

যাঁহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে বিলাত যাওয়ায় যে পরিমাণ ব্যয়, কিছুতেই সে পরিমাণ লাভ নাই—তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, অলাভকর বাণিজ্যে স্বতঃই মনুষ্যের অপ্রবৃত্তি জন্মে; সুতরাং যদি বস্তুতঃই ইহা অলাভকর হয়, তাহা হইলে, লোকে ইহা হইতে আপনিই নিরস্ত হইবে। দশ জনের ক্ষতি দেখিয়া, আর দশ জন আপনিই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। লাভ ও ক্ষতি গণনা মনুষ্যের অতি প্রবল স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাহাতে অপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমাজ-শাসনের অধীন নহে। সমাজ অন্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্তের প্রতি যখন খড়্গহস্ত হন না, তখন বিলাতে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ক্ষতিগ্রস্তের প্রতি সমাজ কেন দণ্ডবিধান করিতে যাইবেন? ইহা সামাজিক অপরাধ নহে, সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিষয়। এ সকল বিষয়ে সমাজ হস্তক্ষেপ করিলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ হইবে, সুতরাং ব্যক্তিগত উন্নতির পথও একেবারে রুদ্ধ হইবে। আর সমাজ ইচ্ছা করিলেই বা কিরূপে এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন?

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ?" (কুমারসম্ভব।)

নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতি এবং অভিলষিত বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তির মনকে ফিরায় কাহার সাধ্য? যখন জননীর অশ্রুজল ও পত্নীর ক্রন্দন বিলাতগমনে স্থিরসঙ্কল্প ব্যক্তির মনকে ফিরাইতে পারে না, তখন সামাজিক শাসনের ভয়ে তাঁহারা নিরস্ত হইবেন, এরূপ আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। ফিরিয়া আসিলে, সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে না পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের যাওয়া নিবারণ করায় সমাজের কি হাত? হিন্দুসমাজ যেরূপ অদূরদর্শী ও অনুদার, তাহাতে সাধ্য থাকিলে যে, এ পথ রুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন, এরূপ নহে। যেখানে সমাজের

ক্ষমতা দেখাইবার সুবিধা আছে, সেখানে হিন্দু-সমাজ ক্ষমতা দেখাইতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন না। বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত যুবকমণ্ডলীর প্রতি হিন্দু-সমাজ যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে পুত্রকে পিতা এক দিন পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে লইয়া ও পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেন না, সেই পুত্র বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আজ পিতার চরণ-তলে লুণ্ঠিতশির; কিন্তু পিতৃদেব আজ সমাজের ভয়ে বা হৃদয়ের কাঠিন্যবশতঃ তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ভূমি-বিলুণ্ঠিত পুত্রকে তুলিয়া আলিঙ্গন না করিয়া—অধিক কি, মুখের কথায় তাহাকে আশ্বস্ত না করিয়া—অন্তর্হিত হইলেন। যদি পিতা মানব-সুলভ অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, পুত্রকে গৃহে স্থান দিলেন, সমাজ সেই অস্পৃশ্য চণ্ডাল-সম পুত্রের আশ্রয়দাতা পিতাকেও পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদিগের সহিত সমাজের সর্ব্বপ্রকার সংমিশ্রণ, সর্ব্বপ্রকার আদান-প্রদান একবারে রহিত হইল। সামাজিক নির্যাতনের ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় দৃশ্য আর কি হইতে পারে?

এই সমাজ-প্রত্যাখ্যাত বিলাত-প্রত্যাগত যুবক-মণ্ডলী ক্রমে দল-বদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু ইহাঁদিগের ভবিষ্যৎ এক্ষণে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। হিন্দু-সমাজ হইতে তাড়িত ও ইউরোপীয় সমাজে অগৃহীত—এই নবীন দলের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ইহাঁদিগের পদমর্য্যাদা-ধন—সাধারণ যুবক-মণ্ডলীর অপেক্ষা অনেক অধিক বটে, কিন্তু সামাজিক সংমিশ্রণ-অভাবে ইহাঁদিগের হৃদয় শুষ্ক ও জীবন মরুতুল্য। এ শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী কে? আমরা বলি, প্রধানতঃ হিন্দু-সমাজ। হিন্দু-সমাজ যদি প্রত্যাবৃত্ত যুবকমণ্ডলীকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিতেন, তাহা হইলে, এই নবীন দল কখনই সমাজকে পদ-দলিত করিতে পারিতেন না। মাতৃ-ক্রোড়ে থাকিয়া, মাতৃ-বক্ষে পদাঘাত করিতে পারে কয় জন? কিন্তু যখন তাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়া দেখেন যে, হিন্দু-সমাজ আর তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের মত স্নেহনয়নে দেখিতেছেন না, তখন তাঁহাদিগের আত্মাভিমান স্বতঃই উদ্দীপিত হয়। তখন তাঁহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ আচার ব্যবহার আরম্ভ করেন। হতাশা-প্রপীড়িত হৃদয়

ক্রমেই স্বজাতির প্রতি মমতাশূন্য হইয়া উঠে। ঘৃণার পরিবর্ত্তে ভক্তি বা মমতা দেখাইতে সমর্থ, এরূপ মহাত্মা জগতে কয় জন আবির্ভূত হইয়াছেন? 'ঘৃণার পরিবর্ত্তে ঘৃণা'—এইই সাধারণ নিয়ম। সাধারণ লোকে ইহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

এই পরস্পর-বিদ্বেষভাবে শুদ্ধ যে এই নবীন দলই ক্ষতি-গ্রস্ত হইতেছেন, এরূপ নহে। হিন্দু-সমাজ ক্রমে মস্তক-বিহীন হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহারা ধন, মান ও পদে সর্ব্বোচ্চ, তাঁহারা সমাজের বাহিরে গিয়া পড়ায়, হিন্দু-সমাজ ক্রমে ক্ষীণ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহারা সকল বিভাগেই বিজেতৃ জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ, তাঁহারা হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত হওয়ায়, হিন্দু-সমাজের মর্য্যাদাও কমিয়া যাইতেছে। অন্তর্ব্বিচ্ছেদে বহিঃশত্রুর আশা স্ফীত হইতেছে। ভারতের ভবিষ্য গৌরবের দিন সুদূর-পরাহত হইতেছে। এমন অবস্থায় কোথায় আমরা ধর্ম্মান্ধ বা ব্যবহারান্ধ প্রাচীন দলকে বুঝাইয়া আমাদিগের জাতীয় জীবনের অভ্যন্তরে নব বল সঞ্চার করিব,—না কোথায় আমরা তাঁহাদিগের কুসংস্কারানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি। ধিক্ আমাদিগের শিক্ষায়। ধিক্ আমাদিগের স্বদেশ হিতৈষণায়!!

সামাজিক নির্যাতন।

আজ কাল ব্রাহ্ম-সমাজ যে আন্দোলনে আমূল আলোড়িত হইতেছে, সেই আন্দোলনে সমস্ত শিক্ষিত হিন্দুসমাজও কিয়ৎ পরিমাণে আন্দোলিত হইয়াছে। এইরূপ আমূল আন্দোলন আমাদিগের মতে অশুভ লক্ষণ নহে, বরং ভারতের ভাবী উন্নতির অগ্র দূত। হিন্দুরাও যে ব্রাহ্মদিগের সুখে দুঃখে ও সামান্য গৃহকার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখিতেছেন, ইহাও একটী বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরূপ আকস্মিক ভীষণ বিপ্লবের কারণ আমাদিগের চক্ষে অতি লঘু। ব্যক্তিবিশেষ ব্যক্তিবিশেষের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। বিবাহ সর্ব্ব-বাদি-সম্মত হইল না। কতক ব্রাহ্ম অনুমোদন করিলেন; অনেকে করিলেন না। স্বপক্ষে হউক, বিপক্ষে হউক, প্রকাশ্যে হউক বা অপ্রকাশ্য লিপিতে হউক—ব্রাহ্মগণ আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। আমাদিগের মতে এই স্থানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম হওয়া উচিত ছিল। ব্যক্তিগত কার্য্য লইয়া যদি সমাজ সতত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে, সমাজের উন্নতি ব্যাহত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব তিরোহিত হইবে। —

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে সমাজিক উন্নতির মূল, সুবিখ্যাত দার্শনিক জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ তদীয় 'স্বাধীনতা' নামক পুস্তকে তাহা সবিশেষ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। সে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা এ প্রস্তাবের কার্য্য নহে। সুতরাং এক্ষণে আমরা কেবল এ স্থলে সেই সিদ্ধান্তটী মূলভিত্তি স্বরূপ ধরিয়া লইব। (একত্র-সম্বদ্ধ ব্যক্তিগণের সমষ্টির নাম সমাজ। যদি সেই ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের চিন্তা ও কার্য্য সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে, ব্যক্তিগত কার্য্যকরী ও চিন্তাবিষয়িণী স্বাধীনতার সহিত সামাজিক কার্য্যকরী ও চিন্তাবিষয়িণী স্বাধীনতাও লোপ হইবে। (চিন্তা ও কার্য্যে সামাজিক স্বাধীনতা না থাকিলে যে, সমাজ এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না, তাহা, বোধ হয়, যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে না; ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মধ্যে সর্ব্বতঃ পরিগৃহীত হইয়াছে। এই সামাজিক স্বাধীনতা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমূহের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যতীত সামাজিক স্বাধীনতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অসম্ভব। অতএব ইহ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সমাজিক স্বাধীনতা প্রার্থনীয় হইলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগ্রে প্রার্থনীয়।)

এক্ষণে দেখা যাউক, এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিরূপে সুরক্ষিত হইতে পারে। যত ক্ষণ না অপরের সুখ ও অপরের স্বাধীনতার

সহিত এক জনের চিন্তা ও কার্য্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তত ক্ষণ তাহাকে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে কার্য্য করিতে ও চিন্তা করিতে দিলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে পবিরক্ষিত হইতে পারে। আমি যাহা ভাল বুঝিলাম, তাহা লিখিলাম বা কার্য্যে পরিণত করিলাম, তাহাতে অপরের সুখ বা স্বাধীনতার কোনও ব্যাঘাত জন্মিল না। তথাপি তাহাতে অপরেব আপত্তি কেন হইবে? সমাজের কি অধিকার আছে যে, এই সকল বিষয়ে আমাব স্বাধীনতা হরণ করেন? তবে সমাজ বলবান্, আমি দুর্ব্বল। সমাজ শক্তিসমষ্টি, আমি এক শক্তির আধাব। আমি সেই এক সূক্ষ্ম শক্তি লইয়া, সেই শক্তি-রাশিব প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে অক্ষম। এই আমার অপরাধ! আমি দুর্ব্বল, তাই আমি অপবাধী। দুর্ব্বলেব প্রতি প্রবলেব অত্যাচার চিবপ্রসিদ্ধ। সেই চিবরুঢ় নিয়মেব অধীনে বলবান্ সমাজ আজ বলহীন অধীনকে একপ নির্যাতন কবিতেছেন। আমি কি কবিয়াছি? আমি বলিয়াছিলাম, কন্যার অন্যূন চতুর্দ্দশ বৎসরে এবং পাত্রেব অন্যূন অষ্টাদশ বর্ষে বিবাহ হওয়া উচিত। আমি এখনও তাহাই বলি। কিন্তু তাই বলিয়া কি, যে শৃঙ্খল শক কবিয়া এক বাব পায় পরিয়াছি, তাহা কি ইচ্ছা হইলেও এ জন্মেব মত আব খুলিতে পাবিব না? ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া, শৃঙ্খল পায় পবিয়াছিলাম, ইচ্ছা হইল, এক বাব খুলিলাম; ইচ্ছা হইলে, হয ত, আবার ইহা পরিতে পাবি। যত ক্ষণ অপবের সুখ ও স্বাধীনতার প্রতিঘাত না কবিতেছি, তত ক্ষণ অপরের নির্যাতন করিবাব অধিকাব কি? তবে আমি সুন্দব বলিয়া সেই শৃঙ্খল বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে পরিতে বলি। ভাল লাগিয়াছিল বলিযা, তাঁহারা তাহা পরিয়াছেন। আমি ত স্বহস্তে তাঁহাদিগকে তাহা পরাইতে যাই নাই। আমার ভাল লাগিয়াছিল, তাঁহাদিগকে পবিতে বলিয়াছিলাম; তাঁহাদিগের ভাল লাগিয়াছিল, তাঁহারাও পরিয়াছেন। আমার ইচ্ছা হইল, আমি এক বার খুলিলাম। তাঁহাদিগেব ইচ্ছা হয়, তাঁহারাও খুলিতে পারেন। যদি তাঁহারা এমন করিয়া পবিয়া থাকেন যে, সে শৃঙ্খল খুলিবার

আর আশা নাই, সে দোষ তাঁহাদিগের। সে দায়িত্ব তাঁহারা নিজ নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আমার উপর কোপ কেন? আমি বলিলাম, তোমাদিগের এইটী করা উচিত। আমার ভাল বলিয়া বোধ হইল, আমি বলিলাম; ভাল কি না, সে বিচার তোমরা করিবে। সে পছন্দ তোমাদিগের হাতে। তোমরা কেন আমি যাহাই বলিব, তাহাই করিবে? আমি যাহা ভাল বলিলাম, তাহা যদি তোমাদিগেরও ভাল লাগিল, তোমরা তাহা করিতে পার; কিন্তু দুই দিন পরে যদি তাহা মন্দ বলিয়া তোমাদের বোধ হয়, আমাকে গালাগালি দিও না, নিজ বুদ্ধিকে তিরস্কার করিও। আমি যাহা ভাল বলিয়া ব্যাপক করিয়াছিলাম, কার্য্যতঃ তাহা করিতে অক্ষম হইলাম। তজ্জন্য আমার উপর খড়্গহস্ত হইও না, কারণ আমি ঘটনার দাস—হয় ত ইচ্ছা থাকিতেও, যাহা ভাল বলিয়া জানি, অবস্থা-বৈষম্যে তাহা করিতে পারিলাম না। ইহাতে তোমার কিছু অনিষ্ট হইতেছে না, তুমি রাগ কর কেন? অসৎ দৃষ্টান্ত? ইহার মীমাংসা হওয়া দুর্ঘট। তুমি বলিবে, 'তুমি যাহা ভাল বলিয়া জান, তাহার প্রতিকূলাচরণ করিলে, সকলে তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিবে'। আমি বলিব, আমি যে অবস্থায় পড়িয়া 'যাহা ভাল বলিয়া জানি—তাহার প্রতিকূলাচরণ করিলাম। ঠিক্ সেই অবস্থায় পড়িয়া, যদি আর এক জনও ঠিক্ সেই কাজ করে, আমি তাহাকে দূষিব না'। তুমি বলিবে, 'কোন স্থানেই নিয়মের ব্যভিচার হওয়া উচিত নয়।' আমি বলিব, 'যেখানেই নিয়ম—সেই খানেই ব্যভিচারের সম্ভাবনা—কারণ মানুষ ঘটনার দাস, মানুষ অভ্রান্ত নহে, মানুষ সম্পূর্ণ সূক্ষ্মদর্শী নয়, ভবিষ্যতে ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই, এমন করিয়া কোন নিয়ম নির্দ্ধারণে অক্ষম।' আমার একমতাবলম্বী কোন অবোধ ব্যক্তি আমার ন্যায়, বিশেষ অবস্থায় না পড়িয়াও, পাছে আমার মত কার্য্য করে—পাছে আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে—এই ভাবনায় যদি আমাকে অহরহ কাটাইতে হয়, তাহা হইলে, আমার মত দুঃখী জগতে আর নাই। আমি কি উদ্দেশে কি অবস্থায় পড়িয়া, একটী কাজ করিলাম, তাহা সকলের

জানিবার সুবিধা নাই। সকলের নিকট আমি হয় ত তাহা বলিতেও ইচ্ছা করি না। আর এক জন অবোধ হয় ত উদ্দেশ্য ও অবস্থা না বুঝিয়া, শুদ্ধ আমি করিয়াছি বলিয়া—বিভিন্ন অবস্থায়, বিনা উদ্দেশ্যে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে—ঠিক সেইরূপ একটী কায করে, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য কি আমি জবাবদিহি করিব? তাহার অজ্ঞতা-অপরাধের দণ্ড কি সমাজ আমার মস্তকে অর্পণ করিবেন? সমাজ এরূপ উৎপীড়ন করেন ত, আমি সামাজিক জীব নহি। আমি সামাজিক সুখের জন্য এরূপ অধীনতা স্বীকার করিতে বা এরূপ অকারণ অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি।

আমি আজ্ সমাজকে বলিলাম, এই কাযটী ভাল, এই কাযটী মন্দ। আজ্ আমার মতে এই কাযটী ভাল বটে, কিন্তু সেই মত যে আমার চির দিন থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? জগতে সকলই পরিবর্ত্তন-শীল। দিন যাইতেছে, আমার শরীর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যখন শরীর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রকৃতির সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন মন অপরিবর্ত্তিত রহিবে, হৃদয়-ভাব একই ভাবে থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যাহা সত্যের আদর্শ বলিয়া জানিতাম, আজ হয় ত আমার নিকট তাহা সত্যের আদর্শ বলিয়া বোধ না হইতে পারে। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যাহা লিখিয়াছি, কি বলিয়াছি, মত-পরিবর্ত্তন হইলেও, শুদ্ধ অবিসংবাদের (consistency) অনুরোধে আমাকে যদি চির জীবন তাহার দাস হইয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে, আমার জীবন বিড়ম্বনা-মাত্র। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি নিজের জন্য যে গণ্ডী কাটিয়াছিলাম, যাহা উল্লঙ্ঘন করা তখন পাপ মনে করিতাম, সে গণ্ডী ছেদন করা আমার মতে এখন পুণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

আর সত্য কি, পুণ্য কি? আমরা হিত-বাদীদিগের সহিত বলি, —জগৎই সত্য স্বরূপ এবং সেই জগতের মঙ্গল-সাধন করাই পুণ্য। জগৎ সত্য-স্বরূপ এবং যে নিয়মে সেই জগৎ পরিচালিত হইতেছে—সে নিয়মাবলীও সত্য-রূপিণী। 'জগৎ' শব্দে আমরা এখানে বাহ্য ও

আভ্যন্তরীণ---উভয় জগৎই গ্রহণ করিলাম। আমরা বলিয়াছি, সেই জগতের নিয়মাবলীও সত্যরূপিণী। পৃথিবী ঘুরিতেছে---যে নিয়মে পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহা একটী অনুল্লঙ্ঘনীয় সত্য; তাহার অপলাপ অসম্ভব। কিন্তু সেই নিয়মটী কি, কিসের ফল, তদ্বিষয়ে মত-ভেদ হইতে পারে; সেই মত সত্য হইতেও পারে, নাও পারে। আজ্ যাহা মাধ্যাকর্ষণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, কাল আর এক জন চিন্তাশীল ব্যক্তি, হয় ত প্রমাণ করিতে পারেন, ইহা অন্য কিছু। যাহা জগতের মঙ্গল-সাধক তাহাই পুণ্য---এ বিষয়ে মত-ভেদ নাই। কিন্তু কি উপায়ে সেই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে মত-ভেদ হইতে পারে। যাহাতে শরীর সবল হয়, তাহা করা উচিত, করিলে পুণ্য, না করিলে পাপ। কিন্তু কিসে শরীর সবল হয়, তদ্বিষয়ে মত-ভেদ হইতে পারে। কেহ বলিবেন, মাংস খাইলে শরীর সবল হয়। কেহ বলিবেন, উদ্ভিদ্ খাইলে শরীর সবল হয়। কেহ বা শরীরের পুষ্টি-সাধনে উভয়েরই উপযোগিতা স্বীকার করিবেন। কেহ বলিবেন, বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিলেই শরীর আপনি পুষ্ট হইবে, মাংস না খাইলেও চলিবে। কেহ বা বলিবেন, বাল্য-বিবাহও রহিত করা চাই, মাংস খাওয়াও চাই। আবার কতক লোক হয় ত বলিবেন, অধিক বয়সের মেয়ের সন্তান দুর্ব্বল হয়। সুতরাং এ সকল বিষয়ে নানা মুনির নানা মত; একমাত্র বিশ্বব্যাপিনী মীমাংসা হওয়া দুর্ঘট। চিকিৎসকদিগেরও এ বিষয়ে মতের সম্পূর্ণ একতা নাই। এ সকল বিষয়ে সত্যাসত্য ও পাপ-পুণ্য-নির্ণয় হওয়া দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং এ সকল, বিষয়ে বিশ্বব্যাপী নিয়ম সংস্থাপন না করিয়া, ব্যক্তি-মাত্রেরই যুক্তি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের উপর সমাজের নির্ভর করা উচিত। যেখানে সমাজ তাহা না করিয়া, ১৯ জনের মধ্যে ১০ জনের মত লইয়া, আর ৯ জনকে অপর ১০ জন কর্ত্তৃক গৃহীত নিয়মের অধীনে আনিতে চেষ্টা করেন, সেই খানেই আমরা ব্যক্তির উপর সমাজের যথেচ্ছাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। ১০ জনের সুবিধার জন্য, দশ জনের সুখোৎপাদনের জন্য, সমাজ ৯ জনের অসুবিধা---৯

জনের অসুখ—উৎপাদন করিলেন। এ পক্ষপাতিতা সমাজের পক্ষে সাজে না। সমাজ জননী; সমাজের ক্রোড়ে সকলই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং সমাজকে সকলেরই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে, সকলেরই সুবিধা ও সুখ দেখিতে হইবে। যদি সেই উনিশ-জনমাত্রে সমাজ গঠিত হয়, তাহা হইলে, সমাজকে সেই উনিশ জনের প্রত্যেকেরই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে; প্রত্যেকের সুবিধা সুখ উৎপাদন করিতে হইবে। যদি এক জনের প্রতিও অবিচার করা হয়, তাহা হইলেও, সে সমাজ দূষিত হইল। সেই এক জনের পক্ষেও সমাজ বিমাতা। বিমাতার ক্রোড়ে বাস করা অপেক্ষা সেই ব্যক্তির মরু-শয্যা বা বন-বাস সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। আমার অস্তিত্ব আমার জন্য, কিন্তু সমাজের অস্তিত্ব আমার (ব্যক্তিমাত্রের) জন্য। আমার সুবিধার জন্য সমাজ গঠিত হইয়াছে, সমাজের সুবিধার জন্য আমি গঠিত হই নাই, সুতরাং সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভাবিবে, প্রত্যেক ব্যক্তির সুখোৎপাদন করিতে চেষ্টা করিবে, না হইলে সমাজের অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই। অল্পের নিমিত্ত বহুকে পরিত্যাগ করাও সমাজের পক্ষে যেমন অত্যাচার, আবার বহুর নিমিত্তে অল্পকে পরিত্যাগ করাও সেইরূপ অত্যাচার। তবে প্রভেদ এই যে, বহুর নিমিত্ত অল্পকে পরিত্যাগ করিলে, সমাজকে ধন্য-বাদ দিবার জন্য অধিক লোক থাকিবে; কিন্তু অল্পের নিমিত্ত বহুকে পরিত্যাগ করিলে, সমাজের নির্যাতন হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। আবার সেই অল্প যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে, সমাজের কোন আশঙ্কা নাই। যাহা হউক, এই উভয়-বিধ অত্যাচারকেই আমরা সামাজিক পীড়া মনে করি। এই পীড়া আরোগ্য না হইলে, সমাজের মৃত্যুর—পতনের —সবিশেষ সম্ভাবনা। এই সামাজিক পীড়াই সামাজিক বিপ্লবের মূল। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণের শূদ্রদিগের উপর—এবং অধুনা ইংরেজ-দিগের ভারতবাসীদিগের উপর অত্যাচার, বহুর উপর অল্পের আধি-পত্যের ফল। ব্রাহ্মণ শূদ্র-স্থলে এই অত্যাচার রাজনৈতিক হইতে সামাজিক আকারে পরিণত হইয়া, হিন্দু-সমাজের উচ্ছেদ-সাধন করি-

য়াছে; শ্বেত-কৃষ্ণ-স্থলে ইহা অদ্যাপি সামাজিক আকার ধারণ করে নাই—এই জন্যই আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সামাজিকতা-সম্বন্ধে পরম সুখে আছি। এরূপ সামাজিক স্বাধীনতা আমরা আর কখন কোন রাজার অধীনে ভোগ করি নাই। কোন দেশের প্রজা কোন রাজার অধীনে কখন এরূপ ভোগ করিয়াছে কি না, জানি না। যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব ভারতে কোন কারণে প্রার্থনীয় হয়, তাহা ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি। রাজ-হস্ত-ক্ষেপ না থাকায়, হিন্দু-সমাজও দিন দিন উদার ভাব ধারণ করিতেছে। ব্যক্তি-গত কার্য্য ও চিন্তার উপর আজ্ কাল ইহা অল্পই হস্ত-ক্ষেপ করিতেছে।

এক দিকে যেমন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও হিন্দু-সমাজ ব্যক্তি-গত চিন্তা ও কার্য্য-বিষয়িণী স্বাধীনতার অনুকূল, ভারতে অতর্কিত ভাবে আর একটী সমাজ উত্থিত হইতেছে, যাহা ব্যক্তি-গত স্বাধীনতার তেমনই প্রতিকূল। একটী শৃঙ্খল ভাঙ্গিতেছে, আর একটী শৃঙ্খল নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। হিন্দুরা যেমন অন্ন-প্রাশন নাম-করণ হইতে আরম্ভ করিয়া, বিবাহ মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের সমস্ত ঘটনাকে কঠোর ধর্ম্ম-শাসনের অধীনে আনিয়া, আপনাদিগের মৃত্যুর পথ আপনারাই প্রস্তুত করিয়াছিলেন—লূতা-তন্তুর ন্যায় আপনাদের জালের অভ্যন্তরে আপনারাই নিহিত হইয়াছিলেন, এই সম্প্রদায়ও সেইরূপ জীবনের সমস্ত ঘটনাকে কঠোর ধর্ম্ম-শাসনের অধীনে আনিয়া আপনাদিগের মৃত্যুর পথ আপনারাই পরিষ্কৃত করিয়া রাখিতেছেন। সমাজ ও ধর্ম্ম যে দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। ধর্ম্মের ভিত্তি বিশ্বাস, সমাজের ভিত্তি যুক্তি। ধর্ম্ম পরকালের, সমাজ ইহকালের। ধর্ম্মের ভিত্তি বিশ্বাস—স্থিতিশীল; সমাজের ভিত্তি যুক্তি—উন্নতি-শীল, সুতরাং পরিবর্ত্তন-শীল। ভূয়োদর্শনের বৃদ্ধির সহিত যুক্তি-শক্তি দিন দিন অধিকতর পরিমার্জ্জিত হইবে, কিন্তু বিশ্বাস যেখানে

থাকিবে, সেখানে একই-ভাবে থাকিবে। বিশ্বাসের বিষয়—পরলোক ও ঈশ্বর; দুইই অতীন্দ্রিয়, সুতরাং ভূয়োদর্শনের অধীন নহে। কিন্তু ভূয়োদর্শনই যুক্তির প্রধান আহার্য্য। ভূয়োদর্শন দিন দিন পুষ্টাবয়ব হইবে, সুতরাং যুক্তি-শক্তিও দিন দিন খরতর হইয়া উঠিবে। যুক্তি-শক্তির প্রখরতার সহিত সামাজিক নিয়ম সকলও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইবে। এই পরিবর্ত্তন-স্রোত ব্যাহত হইলেই, সমাজ সংরুদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় দূষিত হইয়া যাইবে; সুতরাং সামাজিক বিপ্লব অনিবার্য্য এবং পঙ্কোদ্ধার দুষ্পরিহার্য্য হইবে। ব্রাহ্ম সমাজ সামাজিক ঘটনা সকলকে কঠোর ধর্ম্ম-শাসনের অধীন করিতে গিয়া, এই স্রোতের গতি রুদ্ধ করিতেছেন। ইহার বিপদ্ তাঁহারা হাতে হাতেই পাইতেছেন ও পাইবেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যে, বহুর উপর অল্পের অত্যাচার বা অল্পের উপর বহুর অত্যাচার—ইহা আমরা দুই একটী উদাহরণ দ্বারা বঝাইয়া দিব। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ধর্ম্মের সহিত সামাজিক সংস্কার মিশাইতে অস্বীকৃত হন, তখন বাবু কেশবচন্দ্র সেন নব্য ব্রাহ্মগণের সহিত তাঁহার মতের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। কেশববাবু বলিলেন, যাহার কণ্ঠে পবিত্র ঝুলিবে, সে আবার ব্রাহ্ম কিসে? যে অসবর্ণ বিবাহ না করিবে, সে বেদিতে বসিবার অযোগ্য। যে যবনান্ন গ্রহণ না করিবে, সে অস্পৃশ্য ও অব্রাহ্ম। দেবেন্দ্র বাবু ধর্ম্ম-বিষয়ে ব্রাহ্ম বটেন, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে সম্পূর্ণ হিন্দু; সুতরাং তাঁহার সহিত কেশবাবুর বনিল না। কেশব বাবু নব্য ব্রাহ্ম-গণ সঙ্গে করিয়া একটী নূতন উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, নাম দিলেন কি না, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ। ইহার অর্থ এই যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদিব্রাহ্মগণ অব্রাহ্ম, নূতন ব্রাহ্মেরাই প্রকৃত ব্রাহ্ম। তাঁহাদিগের অপরাধ যে, তাঁহারা সামাজিক বিষয় ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিতে চাহেন নাই। কেশব বাবু এই নব্য ব্রাহ্ম-গণের সাহায্যে ও নিজের অসাধারণ সৃষ্টিকরী বুদ্ধি-বলে নব নব সামাজিক নিয়ম গঠিতে বসিলেন; গঠিয়া, তাহাদিগকে কঠোর ধর্ম্ম-

শাসনের অধীনে আনিলেন। শাসনপত্র বাহির হইল যে, তাঁহার গঠিত সামাজিক নিয়ম সকল যে লঙ্ঘন করিবে, সে অব্রাহ্ম হইবে ও ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে। দুই এক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই শাসন অক্ষরে অক্ষরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি একটী নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কন্যা চতুর্দ্দশ বৎসর ও পাত্র অষ্টাদশ বৎসরের নিম্নে বিবাহ করিতে পারিবে না। এই নিয়মের উপর তিনি কঠোর ধর্ম্মশাসন সংস্থাপিত করেন। যে ইহা লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে। কিন্তু মানুষ ঘটনার দাস—তিনি স্বয়ং আজ সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকট হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, সেই শিক্ষাবলে তাঁহাকেও সিংহাসনচ্যুত করিলেন। এই রূপে অন্যের উপর বহুর ঘোরতর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল। তিনি লূতাতন্তুর ন্যায় নিজ কৃত জালের অন্তর্গত হইলেন। তিনি যদি এই কঠোর নিয়মকে ঘোরতর ধর্ম্ম-শাসনের অধীনে না আনিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় থাকিত। তাঁহার নিজের কন্যার বিবাহ তিনি দিবেন, তাহাতে অপরের একটী কথাও বলিবার অধিকার থাকিত না। তাঁহার এমন সুখের দিনে আজ এমন বিষাদ ঘটিত না। আজ তাঁহার শিষ্যেরা —উন্মত্ত হস্তী যেমন মাহুতকে পদ-দলিত করে—সেইরূপ তাঁহার অসংখ্য গুণ বিস্মৃত হইয়া, কীটের ন্যায়, তাঁহাকে পদদলিত করিতে পারিতেন না। তিনি ধর্ম্ম সিংহাসনে অটল থাকিতে পারিতেন। তাঁহার এই পতনে কাহার নয়ন হইতে না অশ্রুপাত হইবে? তিনি দেশের একটী মস্তক; তাঁহাকে আজ সামান্য কীটেও ভক্ষণ করিতেছে; সামান্য অজাত-শ্মশ্রু বিদ্যালয়ের ছাত্রেও তাঁহার মস্তকে পদার্পণ করিতেছে। আমরা ব্রাহ্ম নহি—আমরা হিন্দু, তথাপি আমরা তাঁহার দুঃখে—তাঁহার অপমানে—সহানুভূতি না করিয়া, থাকিতে পারিতেছি না। অন্যের উপর বহুর অত্যাচারে আমাদিগেরও হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, কিন্তু এ দোষ কার? এ দোষ তাঁহার

নিজেরই; সুতরাং আমরা কি করিব? উৎপীড়িত মানবের জন্য অশ্রুপাত করা ব্যতীত আমাদিগের আর কি ক্ষমতা আছে?

আর যে বহু এই অল্পের উপর অত্যাচার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি, তাঁহারা কেশব বাবুর ন্যায় গুরুর বধের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, আপনাদিগের জন্য ভবিষ্য শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। যে উন্মত্ত তরল মতি যুবকদিগকে তাঁহারা ধর্ম্মোন্মাদে উন্মাদিত করিতেছেন, তাহারা যে, এক সময়ে তাঁহাদিগকেও মত্ত হস্তীর ন্যায়, মস্তক হইতে নামাইয়া, পদ তলে উন্মথিত করিবে না, তাহার প্রমাণ কি? যে সকল কঠোর সামাজিক নিয়ম তাঁহারা ঘোরতর ধর্ম্ম শাসনের অধীনে আনিতেছেন, তাহা যে, তাঁহারাই সাকল্যে প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পরিবেন, তাহার প্রমাণ কি? কেশব বাবুর ন্যায় গুরূপ গঠিত চরিত্রেরও যখন স্খলন হইল, তখন তাঁহাদিগেরও যে হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? তাঁহারা কি এক বার ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, তাঁহাদিগেরও এক বার স্খলন হইলে, যে হস্তিরূপী বহুত্বকে (Majority) তাঁহারা উন্মাদিত করিয়া রাখিলেন, সেই উন্মত্ত হস্তী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকেও পদ-দলিত করিবে; সুতরাং অভ্রান্ত নেতা ভিন্ন কেহই অধিক দিন এই সমাজের অধিনেতৃত্ব-পদে অভিষিক্ত থাকিতে পরিবেন না, কিন্তু জগতে কোন মানুষ্যই অভ্রান্ত নহে, সুতরাং কাহারই অধিক দিন এই সমাজের নেতৃত্ব-পদে অভিষিক্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে নেতার পর নেতা বহুত্বরূপী হস্তীর পদ-তলে দলিত হইবে। সুতরাং এখনও বলি, বর্ত্তমান নেতৃ-বৃন্দ যেন ধর্ম্ম হইতে সামাজিক নিয়ম সকল বিশ্লিষ্ট করিয়া, সামাজিক নির্যাতনের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত করেন এবং ভারতবাসী ব্রাহ্মদিগের ভাবী উন্নতি ও সুখের পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখেন। যেন নব-নির্ম্মিত শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে ভবিষ্যতে আর একটী বিপ্লবের প্রয়োজন না হয়।

ভারতের ভাবী পরিণাম।

হত-ভাগ্য ভারত-বাসীর অদৃষ্টে এ দুঃখ কত কাল থাকিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আজ্ প্রায় সহস্র বর্ষ হইতে চলিল, দিল্লী-সমরে পৃথুরাজের পরাজয় ও মৃত্যুর সহিত ভারতের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। মহম্মদ ঘোরী হইতে লর্ড ক্লাইব পর্য্যন্ত অসংখ্য আক্রান্তা যে ভারত-ক্ষেত্রে আপনাদিগের রণ-নৈপুণ্য ও বুদ্ধি-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন——বীরত্ব ও ধূর্ত্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন;——সে ভারত যে এখনও জীবিত আছে, সে ভারতের অধিবাসীরা যে এখনও আত্ম-স্বত্ব পুনঃ সংস্থাপনের জন্য ব্রিটিশ জাতির সহিত বাক্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য! যে ভারত-বর্ষীয় আর্য্যেরা এক দিন বীর-দর্পে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন; যাঁহাদিগের দর্শন, যাঁহাদিগের বিজ্ঞান, যাঁহাদিগের সাহিত্য—এখনও জগতের বিস্ময়োদ্দীপক রহিয়াছে;—সেই আর্য্য-জাতির সন্ততি-গণ এক্ষণে ব্রিটিশ-সিংহের প্রতাপে কম্পিত-কলেবর! তাঁহাদিগের তেজ, বীরত্ব, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণগুলি একে একে সমস্তই অস্তমিত হইতেছে। জগল্ললাম-ভূতা যে আর্য্য-ললনা এক দিন অসিহস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই আর্য্য-ললনা এক্ষণে পুত্র-কন্যাদিগেরও শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রকাশের প্রতিকূল। অস্ত্র-ধারণ, যুদ্ধে গমন ও অন্যান্য দুঃসাহসিক কার্য্যে অবতরণ—এক্ষণে তাঁহাদিগের গভীর ভীতির কারণ। পুত্র-কন্যা-গণ কোনও দুঃসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হন, ইহা তাঁহাদিগের একান্ত অনিচ্ছা। যাহা অল্পায়াস-সাধ্য, যাহা বিপদ্-সঙ্কুল নহে, এরূপ নিরীহ কার্য্যে তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততি-গণ প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁহাদিগের ইচ্ছা, তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ, ফলও পরিণত হইয়াছে। নিরন্তর মসী-মর্দ্দনে, গ্রন্থ-ভারবহনে, জিহ্বা-সঞ্চালনে ও শ্বেতাঙ্গ-চর্ম্মপাদুকা-প্রহার-সহনে

ভারত-সন্ততি-গণের এক্ষণে সুখে দিনাতিপাত হইতেছে—অভ্যাস-ক্রমে প্রকৃতি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে আর্য্য-জাতি এক সময়ে পরের ভ্রূকুটী-মাত্রও সহিতে পারিতেন না, এক্ষণে পরের চরণরেণু সেই আর্য্যজাতির শিরোভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে। দাসত্ব, অপমান—এক্ষণে তাঁহাদিগের অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিয়াছে।

এ দিকে যে প্রবল-পরাক্রম মুসলমানেরা এক সময় হস্তিনা-পতি পৃথু-রাজের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া গভীর নিনাদে ভারত প্রতি-ধ্বনিত করিয়াছিলেন, বীর-দর্পে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতকে কম্পমান করিয়া তুলিয়াছিলেন,—মোগল, পাঠান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সেই মুসলমানেরা একে একে দিল্লীর সিংহা-সন হইতে বিচ্যুত হইয়া বিজিত আর্য্যদিগের সহিত সম-দশাপন্ন হইলেন। ব্রিটিশ-সিংহের প্রবল প্রতাপে জেতা ও বিজিত এক সমান হইয়া গেল। বিশ্বব্যাপী প্রলয়-কালে যেমন গো-ব্যাঘ্রে ও ভেক-সর্পে একত্র বাস করে, সেইরূপ জেতা বিজিত এক্ষণে আত্ম-রক্ষায় ব্যাকুল হইয়া এক ভ্রাতৃ-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে রাজনৈতিক সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান এক সহানুভূতি-সূত্রে সম্বদ্ধ।

ভারতবাসিগণ মুসলমানদিগের অধীনে নানা কষ্ট, নানা যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা সে সমস্ত কষ্ট, সে সমস্ত যন্ত্রণা এই বলিয়া সহ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের পরিশ্রমের ধন দেশের বাহিরে যাইতেছে না। তাঁহাদিগের মনে এই সান্ত্বনা ছিল যে, সিংহাসন ব্যতীত ভারতের আর সমস্ত পদই তাঁহাদিগের অধিগম্য। তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদিগের বীরবল, তাঁহাদিগের তোদরমল্ল, তাঁহাদিগের মানসিংহ—দিল্লীশ্বরের সচিবত্ব, মন্ত্রিত্ব ও সেনাপতিত্ব পদ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। রাজ-সিংহাসনের নিম্নে ঐ গুলিই সর্ব্বোচ্চ পদ। তাঁহারা জানিতেন, উপযুক্ত হইলে, তাঁহারা যখন সেই সর্ব্বোচ্চ পদেও অধিরোহণ করিতে সক্ষম, তখন অন্যান্য পদ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের করতলস্থ। তাঁহারা জানিতেন যে, মুসলমানেরা যতই কেন যথেচ্ছাচারী হউন না, যতই কেন প্রজাশোষক হউন

না, তাঁহারা এক্ষণে ভারতের অধিবাসী, সহবসতিতে ভারতবাসী আর্য্যদিগের ভ্রাতা; তাঁহাদিগের দেহ ভারতের পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে—তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততি-গণের দেহ ভারতের পঞ্চভূতে গঠিত হইবে—তাঁহাদিগের অতুল সম্পত্তি ভারত-ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হইবে। এই আশা—এই সান্ত্বনা—ভারতবাসী আর্য্যদিগের নয়নজল মুছাইয়া দেয়, তাঁহাদিগের হৃদয়ের বেদনা কথঞ্চিৎ অপনীত করে, এবং অধীনতা-শৃঙ্খল কিঞ্চিৎ মসৃণিত করে। তাঁহারা জানিতেন যে, ভারতকে দরিদ্র করা, ভারতের অধিবাসীদিগকে হীনাবস্থায় রাখা, মুসলমানদিগের স্বার্থ-বিরোধী। তাঁহারা জানিতেন যে, মুসলমানদিগের ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ ছিল না, যে দেশকে অলঙ্কৃত করা, যে দেশকে অর্থভাবে সমুদ্র-জলে নিমগ্ন করা, মুসলমানদিগের প্রাণপণ চেষ্টার বিষয়ীভূত হইতে পারে। মুসলমানেরা ভারতের ধনে ধনী—ভারতের মানে মানী—ভারতের সুখে সুখী। সুতরাং যে ভারতের ধনে তাঁহারা ধনী, যে ভারতের মানে তাঁহারা মানী, এবং যে ভারতের সুখে তাঁহারা সুখী, সে ভারতকে সর্ব্বস্বান্ত, অপমানিত ও অসুখিত করায়, মুসলমানদিগের কোন প্রলোভন হইতে পারে না—এই জ্ঞান তদানীন্তন ভারতবাসীদিগকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিল। এই জন্য ভারতবাসী মুসলমানেরা ভারতের অধিবাসীদিগের তত দূর বিদ্বেষের ভাজন হন নাই। তাঁহাদিগের রাজ-নীতি, তাঁহাদিগের শাসন-প্রণালী, তাঁহাদিগের বিধি, তাঁহাদিগের ব্যবহার-বিজ্ঞান দূষিত হইলেও, তাঁহাদিগের সর্ব্ব-দোষ-নাশী এক গুণ ছিল—তাঁহারা ভারতবাসী ছিলেন। তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব এই দেশেই ছিল। তাঁহাদিগের লুণ্ঠন-সংগৃহীত ধন এই দেশেই ব্যয়িত হইত। তাঁহারাও প্রজা-শোণিত-শোষী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই শোণিতে ভারত-ক্ষেত্রকেই উর্ব্বরা করিতেন; এই জন্য প্রজারা বক্ষ চিরিয়া রক্ত দিতেও তত দূর কাতর হইতেন না।

কিন্তু এক্ষণে সুসভ্য ইংরাজ-জাতির অধীনে আমাদিগের কি সান্ত্বনা, কি প্রবোধ? সত্য, তাঁহাদিগের লৌহ-বর্ম্ম শতধা বিচ্ছিন্ন

ভারতকে ক্রমে পরস্পর-সন্নিকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছে; সত্য, তাঁহাদিগের তড়িৎবার্ত্তাবহ সংবাদ-দানে দূরবিক্ষিপ্ত বন্ধু বান্ধবদিগের বিচ্ছেদ দুঃখ কথঞ্চিৎ অপনীত করিতেছে, সত্য, তাঁহাদিগের বাষ্পীয় পোত দেশ-দেশান্তরের ও দ্বীপ দ্বীপান্তরের অধিবাসীদিগের সহিত ভারতের অধি-বাসীদিগের সখ্য-ভাব সংস্থাপিত করিতেছে, নানা স্থানের নানা দ্রব্য আনিয়া ভারতের ভোগ-সীমা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, সত্য—তাঁহা-দিগের সাহিত্য, তাঁহাদিগের দর্শন, তাঁহাদিগের বিজ্ঞান, তাঁহাদিগের ইতিহাস, তাঁহাদিগের রাজ-নীতি, তাঁহাদিগের সমাজ-নীতি আমা-দিগকে অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা দিয়াছে; সত্য, তাঁহাদিগের প্রচণ্ড গোলক, ভারতকে বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে; সত্য, তাঁহাদিগের কঠিন দণ্ড-নীতি, তস্করতা প্রভৃতিকে প্রায় শ্রুতি-মাত্র-পর্য্যবসায়িনী করিয়াছে, সত্য, তাঁহাদিগের শাসন-প্রণালী ভারতে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছে, সত্য, তাঁহাদিগের শিল্প ভারতের বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিয়াছে; কিন্তু সে সহস্র গুণ এক দোষে নষ্ট হইয়াছে—ইংরাজেরা বিদেশী। বিদেশী বিজেতার প্রতি বিদেশী বিজিতের কখনই সহানুভূতি হইতে পারে না। ধর্ম্ম ভিন্ন, জাতি ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, দেশ ভিন্ন, বর্ণ ভিন্ন, অশন বসন ভিন্ন, রীতি নীতি ভিন্ন, বল বুদ্ধি ভিন্ন—এরূপ জাতির সহিত ভারত-বাসীর সহানুভূতি কত দূর সম্ভব, জানি না। এরূপ বিভিন্নপ্রকৃতিক জাতিদ্বয়কে পরস্পর সখ্য সূত্রে সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও, কত দূর সফল হইবে, বলিতে পারি না।

শ্বেতদ্বীপের প্রতি পরিবার ভারত দ্বারা কোন না কোন প্রকারে উপকৃত হইতেছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্ম-দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতের প্রত্যেক নগর হইতে প্রতি মাসে অসংখ্য মুদ্রা শ্বেতদ্বীপে প্রেরিত হইতেছে। ভারতের সমস্ত উচ্চ পদই প্রায় শ্বেতপুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভার-তের সবিশেষ লাভকর বহির্বাণিজ্য প্রায়ই শ্বেতপুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে! ক্ষুদ্র সূচিকা ও সামান্য দেশলাই হইতে পরিধেয় বস্ত্র

পর্য্যন্ত আমাদিগের সমস্ত গৃহ-সামগ্রীর জন্য আমাদিগকে শ্বেতপুরুষদিগের শ্বেত চরণে প্রতিদিন কোটী কোটী মুদ্রা অঞ্জলি প্রদান করিতে হইতেছে! কত কোটী টাকা ভারত হইতে প্রতি মাসে শ্বেতদ্বীপে যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করিতে আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভারতের ভাবী পরিণাম কি হইবে, ভাবিতে গেলে, আমাদিগের বক্ষঃস্থল নয়ন-জলে ভাসিয়া যায়। ভারত দিন দিন কঙ্কালাবশিষ্ট হইতেছে! ভারতের শিল্পীরা অন্নাভাবে তনু-ত্যাগ করিতেছে। ভারতের কৃষকেরা আপনাদিগের পরিশ্রমের ধনে বঞ্চিত হইতেছে! ভারতের মধ্য-শ্রেণীর লোকেরা দারিদ্র্য-ভরে ক্রমে রসা-তলে যাইতেছে! ভারতের উচ্চশ্রেণী ইংরাজ-তুষ্টিবিধানে সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রমে কৌপীন-ধারী হইতেছে। বোধ হইতেছে, যেন ভারতে প্রলয়-কাল উপস্থিত। বোধ হইতেছে, যেন বিধাতা ভারতের ধ্বংস-বিধানের নিমিত্ত শ্বেতপুরুষদিগকে এ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। যে জাতি দ্বারা ভারতের এতাদৃশ দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, সে জাতির সহিত ভারতের সখ্য ভাব প্রার্থনীয় হইলেও, কখন বদ্ধমূল হইবে কি না, জানি না।

মুসলমানদিগের সময়ে ভারত অনেক পরিমাণে স্বাধীন ছিল। প্রত্যেক জমিদার এক এক স্বাধীন রাজা-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদিগকে বৎসরে বৎসরে মুসলমান রাজাদিগকে কিছু কিছু কর দিতে হইত বটে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন। তাঁহাদিগের নিজের সৈন্য ছিল, তাঁহাদিগের নিজের বিচারালয় ছিল, তাঁহাদিগের নিজের দণ্ড-বিধি ছিল, তাঁহাদিগের নিজের বিধি-ব্যবস্থাপনের শক্তি ছিল, প্রজাদিগের দেহ প্রাণের উপর তাঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। প্রজারা স্বজাতীয় রাজার অধীনে সহস্র গুণে অধিকতর সুখী ছিল। এক্ষণে ব্রিটনের প্রচণ্ড শাসনে রাজা প্রজা সকলই থরহরি কম্পমান। স্বাধীনতার ভাব সকলেরই অন্তর হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমরা যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই ব্রিটনের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে পাই। বোধ হয়, যেন ভীষণ

ব্রিটিশ কামান আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। বোধ হয়, যেন শাণিত ব্রিটিশ বেয়নেট্ আমাদিগের প্রতি ভ্রূকুটী করিতেছে! বোধ হয়, যেন আমরা চতুর্দ্দিকে এক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি! যেন শ্বেতপুরুষেরা আমাদিগের সেই প্রকাণ্ড কারায় প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছেন! আমরা তাঁহাদিগের সেই ভীষণ মূর্ত্তিই সতত দেখিতে পাই। তাঁহাদিগের হৃদয়ে দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি মানবোচিত গুণগুলি আছে কি না, তাহা জানিবার আমাদের বিশেষ উপায় নাই। এরূপ জাতির সহিত ভারতের সখ্য-ভাব সংস্থাপনের চেষ্টায় কিছু ফলোদয় হইবে কি না, বলিতে পারি না।

ব্রিটিশ দণ্ড-বিধির ন্যায়পরতা ব্রিটিশ বিধি-সকলের লক্ষ্যের উদারতার নিকট আমরা মস্তক অবনত করি। আমরা জানি, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা বিজিত শূদ্রদিগের প্রতি এবং ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা বিজিত হিন্দুদিগের প্রতি এরূপ অপক্ষপাতিতা ও এরূপ উদারতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সেই নিমিত্ত অনন্ত কালের জন্য ভারতের ভবিষ্য পুরুষের নিকট ব্রিটনের গৌরব পরিরক্ষিত হইবে। কিন্তু যে প্রণালীতে ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তৃগণ সেই দণ্ড-বিধির পরিচালন করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে * * * * * * বলিয়া প্রতীতি হয়। * * * * * * * * * * প্রভৃতি তাঁহাদের আদর্শ। এই সকল শ্বেতপুরুষেরা দুর্ব্বল ভারতবাসীদিগকে মানব-কুলের অনুপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাঁরাই ইংলণ্ডের বিপুল যশে কলঙ্কারোপ করিতেছেন। আমাদিগের দেহ প্রাণ, ধন মান ইহাঁদিগেরই হস্তে নিহিত রহিয়াছে। ইহাঁরাই আমাদিগের প্রকৃত রাজা—প্রজা-বন্ধু ভক্তি-ভাজন মহারাণী সাক্ষি-গোপাল-মাত্র। ইহাঁদিগেরই দোষে তাঁহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কারোপ হইতেছে। তাঁহার প্রতি আমাদিগের ভক্তি অচলা; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ইংলণ্ডের বিশ্বপ্রেমিক মনীষিগণের সহিতও আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। আমরা মিল্, ফসেট্, ব্রাইট্, গ্লাডষ্টোন্ প্রভৃতিকে দেখিতে পাই

না; তাঁহাদিগের মানব-প্রেম, তাঁহাদিগের স্বদেশানুরাগ, তাঁহাদের ভারত-হিতৈষিতা আমরা সংবাদ-পত্রে ও পুস্তকাদিতে পাঠ করি মাত্র। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? প্রতিদিন অসংখ্য ভারতবাসী যে এই সকল যথেচ্ছাচারী পাষাণ-হৃদয় শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের তাঁহারা কি করিবেন? রাজ-চন্দ্রের দুর্বিষহ কারা-যন্ত্রণার তাঁহারা কি করিবেন? লালচাঁদের অবমান তাঁহারা কেমন করিয়া নিবারণ করিবেন? নয়ন-তারার নয়নের জল তাঁহারা কেমন করিয়া মুছাইবেন? কত সহস্র রাজচন্দ্র, কত সহস্র সইস, কত সহস্র লালচাঁদ, কত সহস্র নয়নতারা যে, ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রতিদিন ঐরূপ অদৃষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাদের জন্য তাঁহারা কি করিতে পারেন? লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে না পারিলে আর তাহাদের ক্রন্দন, তাহাদিগের মৃত্যু-শয্যায় রোদন—সেই মানীষীদিগের কর্ণগোচর হইবে না। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কই? আর কর্ণগোচর হইলেই বা তাঁহারা কি করিতে পারেন? পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহারা সততই হীন-বল। পার্লিয়ামেণ্টের অধিকাংশ সভ্যই ভারত বিষয়ে হয় উদাসীন, নয় বিদ্বেষ-পরিপূর্ণ। সুতরাং ভারতবাসীদিগের অশ্রু-মোচনে তাঁহাদিগের কয়েক জনের সামর্থ্য কি? তাঁহাদিগের কয়েক জনের গুণাগুণে ভারতবাসীদিগের সুখ-দুঃখের সম্ভাবনা কি? ভারতবাসীর সুখ দুঃখ প্রধানতঃ ভারতবাসী ইংরাজদিগের গুণাগুণের উপরই নির্ভর করিতেছে। বিশেষতঃ নূতন কার্য্য-বিধির বলে আজ্ কাল ম্যাজিষ্ট্রেট্-রাই ভারতের প্রকৃত রাজা! সুতরাং ভারতবাসীর সুখ-দুঃখ সেই ম্যাজিষ্ট্রেট্দিগের গুণাগুণেরই উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে। ইহাঁরা কিরূপ গুণশালী, তাহা আমরা প্রতিদিন স্বচক্ষে দেখিতেছি। প্রতিদিন সংবাদ-পত্র-যোগে তাঁহাদিগের অতুল গুণের বিপুল পরিচয় পাইতেছি। যে ইংরাজ-জাতি সভ্যতা-বিষয়ে জগতের আদর্শ-স্থল, স্বাধীনতার অদ্বিতীয় সমর্থক; সেই ইংরাজ-জাতির প্রতি আমাদের বিদ্বেষ বুদ্ধি, সেই ইংরাজ-জাতির প্রতি আমাদের ঘৃণা—এই মহাত্মা-

দিগেব জন্যই দিন দিন অধিকতর বলবতী হইতেছে। এই বিদ্বেষ এবং এই ঘৃণার পবিণাম কি হইবে, ভাবিতে গেলে, আমাদিগের হৃদয় বিকম্পিত হয়! যত দিন এই ঘৃণা ও বিদ্বেষানল ভারতবাসীদিগের অন্তরে প্রধূমিত থাকিবে, তত দিন ইংরাজ-জাতির প্রতি ভারতবাসীর মনকে প্রীতি-প্রবণ করার চেষ্টা স্রোতের মুখে তৃণ-নিক্ষেপের ন্যায় হইবে, সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইংলণ্ডের বিজ্ঞান, ইংলণ্ডের দর্শন এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষীয় শিক্ষা-প্রণালী স্বার্থপরতা, অনুদারতা ও স্বেচ্ছাচারিতা-দোষে দূষিত না হইলে, এত দিন আমরা আরও অনেক শিক্ষা করিতে পারিতাম। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দিন দিন উচ্চ শিক্ষার বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস উড্ ভারতবর্ষের শিক্ষা-বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট ডেস্‌প্যাচ্ প্রেরণ করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুসরণ করিতেছেন না। তাঁহারা লোক-সাধারণের শিক্ষা-বিধানচ্ছলে উচ্চ শিক্ষার পথে অনেক কণ্টক রোপণ করিতেছেন। লোক-সাধারণের শিক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। যে ইতিহাস-পাঠে লৌকিক জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়—স্বাধীনতার ভাব প্রবল হয়, যে বিজ্ঞান-পাঠে বহির্জগতের উপর মনুষ্যের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা জন্মে; যে দর্শন-পাঠে অন্তর্জগতের উপর মনুষ্যের শক্তি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়; যে উচ্চতর অঙ্ক-শাস্ত্রের আলোচনায় বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় পরিমার্জিত হয়, এবং যে সাহিত্য-পাঠে হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি সকল তেজস্বিনী হয়;—সে ইতিহাস, সে বিজ্ঞান, সে দর্শন, সে সাহিত্য ও সে উচ্চতর অঙ্ক-শাস্ত্রের আলোচনা হইতে জন-সাধারণ একেবারে বঞ্চিত। সাহিত্যের মধ্যে বর্ণ-পরিচয়, অঙ্ক-শাস্ত্রের মধ্যে গণিতের মূলসূত্র—তাহাদিগের পাঠনার আদি ও অন্ত। ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর মধ্যে এক কোটীরও অল্প লোক এইরূপ জঘন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। অবশিষ্ট উনবিংশ

কোটীর মধ্যে এক লক্ষ লোকও উচ্চশিক্ষা পাইতেছে কি না, সন্দেহ-স্থল। সেই উচ্চ শিক্ষা আবার একরূপ জঘন্য প্রণালীতে সম্পাদিত হয় যে, তাহাকে উচ্চশিক্ষা বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। যে সকল গ্রন্থ ইংলণ্ডীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও অঙ্ক শাস্ত্রের ভূষণ বলিয়া পরিগণিত, তাহার মধ্যে দুই এক খানি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রবেশিকা ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষায় অসার পুস্তকের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষিত যুবকেরা এক্ষণে আপনাদিগের দুরবস্থা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছেন, তাহারা আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ-সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজদিগের কার্য্যের দোষ দেখাইতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজ-পূজা-রূপ পৌত্তলিকতার মূলচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সংক্ষেপতঃ তাঁহারা এক্ষণে মানুষ হইতে শিখিয়াছেন। এ সুখ-সমাচার শ্বেতপুরুষদিগের অসহনীয়। শ্বেতপুরুষেরা ষড়যন্ত্র করিলেন যে, এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহাদিগকে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতে হইবে, তাঁহাদিগের চক্ষু ফুটিতে দেওয়া হইবে না। শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ পদবী-স্থিত কতিপয় শ্বেতপুরুষ অপার জলধি পারে আসিয়া, অতি ক্লেশে বিপুল অর্থব্যয়ে কতিপয় অসার গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন, অমনি সিন্‌ডিকেটের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল! স্বজাতি-পক্ষপাতিতায় ন্যায়-পরতা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান তিরোহিত হইল। সেই অসার গ্রন্থগুলি আপনারা ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন স্বজাতি পক্ষপাতিতানলে আহুতি প্রদান করেন, এরূপ সাধ্য নাই! এই জন্য হতভাগ্য ভারত-যুবকের উপর সেই গুলির ক্রয়-ভার অর্পিত হইল! শুদ্ধ ইহাতেই নিস্তার নাই—হত-ভাগ্য ভারত-যুবক সেই অসার তুষ-রাশি উদরস্থ করিতে আদিষ্ট হইলেন। ভারতবর্ষীয় যুবকের ক্ষীণ মস্তিষ্ক এই গুরুভারে প্রপীড়িত হইল, অর্দ্ধাশনে জীর্ণ দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে একটী অসার কঙ্কাল বাহির হইল। শিরোবেদনায় অস্থির—গৃহিণী-

পীড়ায় প্রপীড়িত একটী অকাল-বৃদ্ধ বিদ্যালয় হইতে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতারিত হইল। চির-রুগ্ন, জীর্ণ-কলেবর, অন্ন-চিন্তায় সমাকুল, নিরুৎসাহ ও দয়ার পাত্র এই ভারত-যুবক হইতে ভারতের কি মঙ্গলের আশা?

ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর মধ্যে দশ কোটীর অধিক স্ত্রী-জাতি। সেই দশাধিক কোটীর প্রায় সমস্তই অনক্ষর। যে দুই চারি জন লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, তাহাদিগেরও কেহই উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধ শিক্ষিতা রমণী-কুল যে ভারতের কলঙ্ক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানব-কুলের অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপিণী স্ত্রী-জাতির পূর্ণ শিক্ষা বিনা জগতের কোনও গুরুতর মঙ্গল সংসাধিত হইবার যে সম্ভাবনা নাই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ভারতের ললনা কুল অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধ শিক্ষিতা থাকিতে ভারতের যে কোনও শুভ নাই, তাহা বলা দ্বিরুক্তিমাত্র। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য পাঠশালা, অসংখ্য স্কুল ও অনেক কালেজ সংস্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু সে রমণী-কুলের জন্য নহে—মানব-কুলের প্রবলতর শাখার জন্য। আজ্ শতাধিক বৎসর ভারতে সভ্যম্মানী ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তথাপি—লজ্জার কথা—ভারতে আজ্ পর্য্যন্ত রমণী-কুলের জন্য একটীও উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হইল না। যে কয়েকটী পাঠ-শালা ও যে কয়েকটী সামান্য স্কুল তাহাদিগের জন্য এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয়। যাঁহারা ভারতের ভাবী বংশধর-গণের জননী, যাঁহারা বর্ত্তমান ভারত-সংস্কারকদিগের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাঁহারা ভারতের গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপিণী, যাঁহারা দুঃখ-ভার-প্রপীড়িত ভারত-বাসীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের একমাত্র জ্যোৎস্না—সেই ভারত-ললনার অন্তর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতে ভারতের কি মঙ্গলের আশা?

ভারত। আর্য্য-জাতির প্রদীপ্ত প্রতিভার বিলসন-ভূমি! রাম-ভার্গব, কর্ণার্জ্জুন, ভীম-কৃষ্ণের বিচিত্রবীর্য্য-প্রদর্শনাঙ্গন! ব্যাস-

বাল্মীকি ও কালিদাস-ভবভূতির কবিত্ব-সরোজ-সরোবর! শঙ্কর-ভাস্করের ক্রীড়া-স্থল! মনু পরাশর ও বুদ্ধ চৈতন্যের জন্মভূমি! লীলাবতীর লীলা-স্থল! দুর্গাবতী ঝান্সীর বীরত্ব-রঙ্গভূমি! বেদের জননি! জগতের আরাধ্য! মানব-কুলের উপদেশক! তোমার অদৃষ্টে শেষে কি এই ছিল? তোমার ভাবী পরিণামে কি হইবে, এই ভাবিয়া, আমাদিগের হৃদয় আকুল। যে ঘোর দুর্দ্দশা-পঙ্কে তুমি এক্ষণে পতিত, তাহা হইতে তোমায় উদ্ধার করে, এমন লোক কই?

জননি! আমরা তোমার অন্নে প্রতিপালিত, তোমার শোণিতে পরিপুষ্ট, তোমার মৃত্তিকায় গঠিত, তোমার মলয়-পবনে অনুপ্রাণিত, তোমার নির্ম্মল জলে অভিসিঞ্চিত, তোমার বিশ্বব্যাপী ধবল যশে উজ্জ্বলিত—কিন্তু আমরা অক্ষম। সেই অনন্ত উপকারের একটীরও প্রতিশোধ করিতে অক্ষম। অক্ষম—কিন্তু অকৃতজ্ঞ নহি। সেই অসংখ্য উপকারের প্রতিশোধ করিতে না পারি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত নহি। জননি! সহস্র বৎসরের দাসত্বে আমাদিগের শোণিত শুষ্কপ্রায়, দেহ মৃতপ্রায়, মন ভগ্নপ্রায়। জননি! সহস্র বৎসরের দাসত্বে তোমার বিপুল দেহ শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ তোমার অপোগণ্ড সন্তানদিগের ক্রন্দনে আকুলিত! চতুর্দ্দিকে শকুনি গৃধিনী, শৃগাল কুক্কুরগণ বিকট শব্দ করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই ঘোর বিপৎ-কালে তাহারা কাহার শরণাপন্ন হইবে? যাহারই আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই রক্ষক হইয়া, তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়ন করা বলবানের স্বধর্ম্ম। বলবানের প্রতি উৎপীড়ন করে, কাহার সাধ্য? জননি। তোমার দুর্ব্বল সন্ততি-গণের বলাগমের উপায় কি? জননি। বহুকালব্যাপী দাসত্বে জীর্ণ কলেবরে প্রকৃত বলাগমের অনেক বিলম্ব। সে বিলম্ব অসহনীয়। এক্ষণে দাসত্বের অবস্থায় বলাগমের উপায় কি? জননি। তবে আমাদিগের কি কোন আশা নাই? যেন কোন দেবতা গম্ভীরস্বরে আমাদিগের এই

প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আছে"। কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে আবার বলিলেন, "একতা ও আত্মত্যাগ।"—ভারতের উদ্ধার-সাধনের একমাত্র উপায় একতা ও আত্ম-ত্যাগ—ভারতের জীর্ণ দেহে বল-সঞ্চারের একমাত্র উপায় একতা ও আত্ম-ত্যাগ।

"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

তৃণেরও সমষ্টি দ্বারা মত্ত হস্তী বন্ধন করা যায়। বিংশতি কোটী ভারত-বাসী একতা বন্ধনে বদ্ধ হইলে কাহাকে ভয়? বিংশতি কোটী ভারত-বাসী স্বদেশের মঙ্গল-সাধন ব্রতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলে ভারতের কি অভাব? বিংশতি কোটী ভারত বাসীর নয়নের জলেও শ্বেতদ্বীপ সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন হইতে পারে। বিংশতি কোটী ভারত-বাসীর দীর্ঘ নিশ্বাসেও ভারতের শ্বেত পুরুষ কয়েকটী উড়িয়া যাইতে পারে। সমস্ত ভারত সমবেত হইলে, অস্ত্র-ধারণের প্রয়োজন কি? দুর্ব্বলের মহাস্ত্র ক্রন্দন। আমরা বিংশতি কোটী দুর্ব্বল ভারত বাসী কাঁদিয়া, ইংলণ্ডের উপর জয়-লাভ করিব! আমরা বিংশতি কোটী ভারত বাসী কাঁদিয়া ইংলণ্ডের নিকট স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব! হিন্দু, মুসলমান,—পারসী য়িহুদী—ফিরিঙ্গী, সাঁওতাল—শীক, বৌদ্ধ—আমরা সমস্ত ভারত-বাসী একতানে কাঁদিয়া, ইংলণ্ডের নিকট আমাদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ স্বত্ব ভিক্ষা করিব। আমাদিগের ঐকতানিক ক্রন্দনে ইংলণ্ডের ভারত-সিংহাসন টলিবে। যে জাতি স্বাধীনতার নামে উন্মত্ত, যে জাতি আত্ম-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেহ প্রাণ, ধন মান সমস্ত বিসর্জ্জন দিতেও উদ্যত, যে জাতির বর্ণতরি অসভ্য আফ্রিক, তাহারদিগেরও দাসত্ব মোচনে সতত সুসজ্জিত,—সেই জাতি যে—সভ্যতার শৈশব-দোলা সরস্বতীর জন্ম-ভূমি—ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর ক্রন্দনে বধির থাকিবেন, বিশ্বাস হয় না। ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী যদি প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন, যদি প্রত্যেকে স্বদেশের মঙ্গল-সাধন-ব্রতে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে শিখেন, যদি প্রত্যেকে ভারতের একোনবিংশতি কোটী অধিবাসীকে সোদরোচিত স্নেহ করিতে শিখেন; যদি সকলে জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ভুলিয়া এক রাজনৈতিক

সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে শিখেন; তাহা হইলে, আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, ইংলণ্ড পুত্র-বৎসল পিতার ন্যায় উপযুক্ত সন্তানদিগের হস্তে তাহাদিগের আত্ম-শাসন ও আত্ম-পালন-কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া, এই গুরুতর পালন-কার্য্য হইতে অবসৃত হইবেন।! যে দিন ইংলণ্ড ভারতের প্রতি এই উদার ও নিরভিসন্ধি ব্যবহার করিবেন, সেই দিনই ইংলণ্ড ভারত-বাসীদিগের প্রকৃত ভক্তি ও প্রকৃত কৃতজ্ঞতার আধার হইবেন। সেই দিনই ইংলণ্ড ও ভারত এক সহানুভূতি-সূত্রে সম্বদ্ধ হইবে! পরস্পরের দুঃখে পরস্পর দুঃখী হইবে! পরস্পরের সুখে পরস্পর সুখী হইবে! পরস্পরের বিপদে পরস্পর প্রাণ দিবে! স্বাধীনতা ও সমতা ব্যতীত সে সহানুভূতি ঘটে না। বর্ত্তমান অবস্থায় এক পক্ষে সমতা ও স্বাধীনতার অভাব রহিয়াছে, সুতরাং এ অবস্থায় সে সহানুভূতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বদেশের মঙ্গল সাধনব্রতে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী পরস্পরের প্রতি পরস্পর সোদরোচিত স্নেহ করিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ভুলিয়া এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী একবাক্যে স্বাধীনতা-প্রিয় ব্রিটনের নিকটে আত্ম-দুঃখ ব্যক্ত করিতে শিখেন; সেই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত—জননী ভারত-ভূমির প্রতি অসংখ্য উপকারের কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন স্বরূপ—১২ই শ্রাবণ বুধবার কলিকাতা-মহানগরী-স্থিত আল্‌বার্ট হলে "ভারত-সভা" নামক এক নূতন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিন ভারতের পুনর্জন্ম দিন! এই দিনে সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব্ব রাজনৈতিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইল। পারলৌকিক ধর্ম্ম পৃথক্ হউক, জাতি পৃথক্ হউক, সমাজ পৃথক্ হউক, তথাপি এ ধর্ম্মের একতা পরিরক্ষিত হইবে। এ ধর্ম্মে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন; সেশ্বর, নিরীশ্বর;

সাকার, নিরাকার; খ্রীষ্টান্, হীদেন—সকলই সমান। সকলেই নির্ব্বি-রোধে এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার কেবল একটীমাত্র নিয়ম আছে—দীক্ষিতদিগের প্রত্যেকেই ভারত-বাসী হওয়া চাই। ইহাতে রাজা, জমিদার, প্রজা প্রভৃতি বিষাক্ত শ্রেণী-বিভাগ নাই। ইহা সাম্য-বাদী। এই ধর্ম্মই ভারত-সভার মূল-ভিত্তি। এই জন্য ভারত-সভা সকলকেই ভ্রাতৃ-ভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। ভারতবাসী। হিন্দু, মুসলমান্, খ্রীষ্টান্, বৌদ্ধ, জৈন, সীক্! আপনারা সকলেই আসিয়া, এই সভায় যোগ দিউন। দেখি-বেন, ভারতের সুখ-সূর্য্য অচিরাৎ সমুদিত হইবে। বৎসরে বৎসরে ভার-তের প্রতি গৃহে যেন এই দিন-উপলক্ষে মহান্ উৎসব হয়, যেন এই দিনে হিমালয় হইতে সিংহল, এবং সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশে ভার-তের যশোগান করে। ভারত এক দিন জগতের সভ্যতা-মার্গের নেতা ছিলেন, এক দিন সমস্ত জগতের শিক্ষক ছিলেন, এক দিন ইহার বীরত্বে মেদিনী বিকম্পিত হইয়াছিল, আবার এমন দিন আসিবে—সে দিন বহুদূরবর্ত্তী নয়—যে দিনে ভারত আবার জগতের সভ্যতা-মার্গের নেতা হইবেন, যে দিনে ভারত আবার সমস্ত জগতের শিক্ষক হইবেন, যে দিনে ভারতের বীরত্ব জগতে পুনর্ব্বার উদ্ঘোষিত হইবে।।। ভারত সভা। এই গভীর লক্ষ্য-সাধনের ভার তোমার অনতি-প্রৌঢ় মস্তকে অর্পিত রহিল। দেখিও, এই গুরু ভার—ও এই গভীর বিশ্বা-সের অপব্যবহার না কর।

ভারতে দুর্ভিক্ষ।

হায়। কি কুদিনে বৈদেশিক চরণ ভারত-বক্ষে অর্পিত হয়। সেই দিনেই ভারতবাসীদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। সেই দিন হইতেই ভারতবাসীদিগের দুঃখ যন্ত্রণা আরব্ধ হইয়াছে।

"ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি"

একটী ছিদ্র ধরিয়া অনর্থ-রাশি জল-প্লাবনের ন্যায় ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিতেছে। আজ্ সাইক্লোন্ (ঝড়), আজ্ জল-প্লাবন, আজ্ দুর্ভিক্ষ, আজ্ মহামারী—এইরূপ প্রতিবৎসরেই শুনা যাইতেছে। আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থ সকলে, অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত জনশ্রুতিতে এরূপ ধারাবাহিক দৈবী আপৎ-পরম্পরার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা যে কখন ঘটিত না এরূপ বলিতেছি না, শত বা সহস্র বর্ষে এক আধ বার ঘটিতমাত্র। তাহাও যে রাজ-পাপ বিনা সংঘটিত হইত না, আর্য্যেরা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। রাজ্যে কোন প্রকার দৈবী আপৎ উপস্থিত হইলে, তখনকার রাজারা আপনাদিগকে দুরাচার বলিয়া আশঙ্কা করিতেন। তাঁহারা ভাবিতেন, অবশ্যই রাজ্যের শাসন-কার্য্যে তাঁহাদিগের কোন-প্রকার স্খলন হইয়া থাকিবে, নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন? অধিক কি, প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন জনিত অকাল-মৃত্যু প্রভৃতিকেও রাজারা তাঁহাদিগের দুঃশাসনের ফল বলিয়া মনে করিতেন। উত্তর-রামচরিতের এক স্থলে লিখিত আছে—"ততো নরাজাপচার-মন্তরেণ প্রজাযামকালমৃত্যুশ্চরতীতি আত্মদোষং নিরূ-পয়তি করুণাময়ে রামভদ্রে**" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বালকের অকাল-মৃত্যু শুনিয়া, করুণাময় রামচন্দ্র মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, রাজদোষ বিনা কখনই এরূপ অকাল-মৃত্যু সম্ভবে নাই। বস্তুতঃ প্রজাদিগের দুঃখ সুখের মূল যে রাজা তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রাজা ভাল হইলে প্রজাদিগের অশেষ সুখ, রাজা মন্দ হইলে প্রজা-দিগের দুঃখের সীমা নাই। রাজা ভাল হইলে প্রজাদিগকে সর্ব্ব-প্রকার দৈবী আপৎ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, এরূপ আমরা বলি না। তবে আমরা বলি এই যে, রাজা ভাল হইলে সে গুলির অনেক স্থলে পরিহরণ করিতে পারেন। যেখানে নিতান্ত অনিবার্য্য, সেখানে তজ্জনিত প্রজাদিগের দুঃখের অনেক উপশমন করিতে পারেন।

গবর্ণমেণ্ট ঝটিকা নিবারণ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু ঝটিকা-জনিত প্রজাদিগের অশেষ যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বাঁধ দ্বারা জলপ্লাবনের পরিহরণ করিতে পারেন, এবং যেখানে বাঁধ-ভঙ্গ বা জলোচ্ছ্বাসের অসাধারণ উচ্চতা নিবন্ধন জল-প্লাবন-নিবারণে একান্তই অসমর্থ হ'ন, সেখানে আন্তরিক চেষ্টা করিলেই জল-প্লাবন-জনিত অনিষ্টের অনেক পরিমাণে নিরাকরণ করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ দ্বারা অনা-বৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষের পৌনঃপুন্যে আবির্ভাব দূর-প্রসারিত করিতে পারেন; এবং জল-প্রসবণ পথ পরিষ্কৃত রাখিয়া ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া, অনেক পরিমাণে মহামারী নিবারণ করিতে পারেন। যেখানে সেই সেই উপায়ে, সেই সেই দৈবী আপৎ অনিবার্য্য, সেখানে রাজকর্ম্মচারীদিগের যত্নে সেই সেই অনি-বার্য্য-আপৎ-জনিত প্রজাদিগের অশেষ দুঃখের নিরাকরণ হইতে পারে। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট যে, সেই সকল দৈবী আপৎ-পরম্পরার নিরাকরণে অথবা নিরাকরণ অসম্ভব হইলে তজ্জনিত প্রজাদিগের শোচনীয় দুরবস্থার উপশমনে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন না, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা এই বলি যে, ইংলিশ গবর্ণ-মেণ্ট আমাদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট, সুতরাং আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও বৈদেশিক কর্ম্মচারীদিগের স্বার্থপরতাবশতঃ চেষ্টা করি-য়াও, ফলে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না।

কোন বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। এই জন্য আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যত দিন আমাদিগকে বৈদে-শিক শাসনের অধীনে থাকিতে হইবে, তত দিন যেন আমাদিগকে অন্য কোন গবর্ণমেণ্টের অধীনে যাইতে না হয়। আমরা বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট-নিচয়ের মধ্যে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট বলি। সুতরাং আমরা বিশেষ রূপে তাহারই পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল আমাদি-

গ্রকে ভোগ করিতেই হইবে। বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল কি, তাহা বর্ণনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তবে কথা তুলিয়া দুই ...টী না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা অনুচিত বোধে, যথাস্থানে সংক্ষেপে এ প্রস্তাবের উপযোগী দুই একটী বলা যাইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, দুর্ভিক্ষের কারণ কি, এবং দুর্ভিক্ষ-নিবারণের উপায়ই বা কি। দুর্ভিক্ষের কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে—খাদ্যাভাবই দুর্ভিক্ষের কারণ অথবা খাদ্যাভাবই দুর্ভিক্ষ। এক্ষণে দেখিতে হইবে, খাদ্যাভাব কত প্রকারে ঘটিতে পারে। যে সকল দেশের শস্যাদির উৎপত্তি পর্জন্যদেবের দয়ার উপর নির্ভর করে, সে সকল দেশে বৃষ্টি না হইলেই, শস্যাদি উৎপন্ন হয় না। ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ নহে, এজন্য মধ্যে মধ্যে ইহার স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যাদি জন্মে না, এবং তজ্জনিত খাদ্যাভাব সংঘটিত হইয়া, সেই সেই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী কে? আমরা বলি, দৈব ও রাজা। কিন্তু দৈবের প্রতি আমাদিগের কোন অভিমান ও কোন অনুযোগ চলে না বলিয়া, আমরা রাজ-স্কন্ধেই সমস্ত দোষ চাপাইব। দুর্ভিক্ষ ঘটিতে না দেওয়া ও ঘটিলে তাহার তৎক্ষণাৎ নিরাকরণ করা এ দুইই অনেক পরিমাণে রাজার করায়ত্ত। যাহা তাঁহার করায়ত্ত ও যত্নসাধ্য, তিনি যদি তৎসাধনে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মের নিকটে ও মানবজাতির নিকটে পতিত।

আমরা দেখাইব, দুর্ভিক্ষের অত্যন্তাভাব-সাধন ও উপশমন রাজার করায়ত্ত ও যত্নসাধ্য কিরূপে। ভারতবর্ষ ত কোন কালেই নদীমাতৃক দেশ নহে, সুতরাং অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যাদির অনুৎপত্তি বা ধ্বংস ত চির কালই চলিয়া আসিতেছে। তথাপি পূর্ব্বেই বা কালেভদ্রে কখন দুর্ভিক্ষের নাম শ্রুত হইত কেন, আর এক্ষণই বা বৎসরে বৎসরে ভারতের কোন না কোন প্রদেশ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইতেছে কেন? দেবতারা কি এক্ষণে ভারতের উপর অধিকতর কুপিত হইয়াছেন? তাহা নহে। ইহার অভ্যন্তরে মানব কারণই নিহিত

আছে। ভারতবর্ষের ন্যায় শস্যশালী দেশ পৃথিবীতে আর নাই। ইহাতে এত অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মে যে, এক বৎসরের অনাবৃষ্টিতে ও তজ্জনিত অজন্মায় কখন শস্যাভাব ও তন্নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হইতে পারে না। পূর্ব্বে অধিবাসীদিগের আহার যোজনা করিয়াও ইহা এত শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত যে, উপর্য্যুপরি তিন চারি বৎসর অনাবৃষ্টি হইলেও, শস্যাভাব বা তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে সুসভ্য রাজার অধীনে স্বাধীন বাণিজ্যের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে! খাদ্য-সঞ্চয় এ সভ্যতার অনুমোদিত নহে। তোমার এ বৎসরের খোরাক চলিতে পারে, এরূপ রাখিয়া তুমি অবশিষ্ট সমস্ত বিক্রয়ার্থ বিদেশে প্রেরণ কর। বিদেশের খাদ্য-সৌকর্য্য ঘটুক, কিন্তু তুমি আগামী বৎসরে কি খাইবে, তাহা ভাবিও না। আগামী বৎসর আসিল, বৃষ্টি হইল না, শস্য জন্মিল না, তুমি রাজার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে "কি খাইব ?" রাজা বলিলেন, "তুমি কি খাইবে, তাহার ভাবনা ভাবিতে আমি বাধ্য নহি। তবে তোমাদিগের সমূহ বিপৎ দেখিতেছি। আচ্ছা! কিঞ্চিৎ সাহায্য করা যাইবে।" রাজা বস্তাকত চাউল আনিয়া, সেই অগণ্য মানবমণ্ডলীর সম্মুখে ধারণ করিলেন। তাহারা অনাহারের জ্বালায় অস্থির হইয়া দুই চারিটী করিয়া দানা খুঁটিয়া খাইল। আবার ক্রন্দন-রোল উঠিল। আবার গগন বিদারিয়া এই চীৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইল—"আমরা খাই কি, অনাহারে মরি যে।" অনাহারে অসংখ্য প্রজার মৃত্যু হইতে আরম্ভ হইল। তখন রাজকর্ম্মচারীদিগের চৈতন্য হইল। রাজ্ঞীর সিংহাসন টলিল! হুকুম হইল যে, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী প্রেরিত হব। রাজ-কোষ হইতে প্রচুর অর্থ প্রদত্ত হইল। তাহার অর্দ্ধেক বৈদেশিক রিলীফ্ কর্ম্মচারীদিগের উদরস্থ হইল। অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের কিয়দংশ দেশীয় রিলীফ্ কর্ম্মচারীদিগের পাপ ধনলিপ্সা চরিতার্থ করিল। যে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের দুঃখের উপশমন হইল না। তাহারা দলে দলে মরিতে লাগিল! উপশমন শিবির সকল তাহাদিগের সমাধি-

মন্দির-রূপে পরিণত হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট ইতিকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তাকাইয়া রহিলেন।

প্রতি দুর্ভিক্ষের সময়েই ত এইরূপ প্রহসন অভিনীত হইয়া থাকে। ইহার জন্য দায়ী কে? আমরা বলি রাজা। রাজা ইচ্ছা ও যত্ন করিলে দুর্ভিক্ষের পরিহরণও করিতে পারেন, উপশমনও করিতে পারেন।

স্বাধীন বাণিজ্য ভাল বটে, কিন্তু তাহার নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মন একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই নিয়মনের শক্তি রাজ-হস্তে নিহিত আছে; সুতরাং রাজা যদি তাহার পরিচালন না করেন, এবং সেই পরিচালনাভাবে রাজ্যের যদি কোন অমঙ্গল ঘটে, তাহার জন্য দায়ী রাজা।

এ স্থলে রাজার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমরা বলিতেছি। উদ্বৃত্ত শস্য বিদেশে প্রেরণ করিয়া তাহার বিনিময়ে মুদ্রা বা বৈদেশিক পণ্য আনয়ন করা প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু কি পরিমাণ শস্য বিনা বিপদে প্রেরণ করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা ও তদতিরিক্ত বিদেশে যাইতে না দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অকরণে রাজার গুরুতর প্রত্য-বায় আছে। প্রত্যেক প্রদেশের, প্রত্যেক জেলার লোক-সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক জেলার লোক-সংখ্যা অনুসারে, তত্তৎপ্রদেশের ও তত্তৎজেলার খাদ্য-পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে। সেই পরিমাণ অনুসারে দুই তিন বৎসরের খাদ্য রাখিয়া, অতিরিক্ত অংশ প্রদেশান্তরে, জেলান্তরে বা দেশান্তরে যাইতে দিতে হইবে। যদি কোন প্রদেশে বা জেলায় শস্য কম জন্মে, তাহা হইলে অন্য প্রদেশ বা জেলা হইতে শস্য আনিয়া সেই অভাব পূরণ করিয়া রাখিতে হইবে। যখন রাজা জানিতে পারিবেন যে, ভারতের সমস্ত প্রদেশে সমস্ত জেলায় এই রূপে দুই তিন বৎসরের খাদ্য মজুত হইয়াছে, তখন তিনি অতিরিক্ত শস্য বিদেশে চালিত করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। এরূপ চালানী কার্য্যে ভারতের কোন অমঙ্গল না হইয়া বরং সৌভাগ্য সীমা পরিবর্দ্ধিত হইবে; এবং দুর্ভিক্ষেরও পরিহরণ হইবে।

কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন যাঁহাদিগের ইষ্ট, ভারতের

মঙ্গল-সাধন যাঁহাদিগের একমাত্র ও প্রধান লক্ষ্য নহে, তাঁহারা যে ভারতের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। এই জন্যই বলিতেছিলাম, বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে।

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের অনুৎপত্তি জন্য দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার পরিহরণ করার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের অনুৎপত্তি যাহাতে না ঘটে, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার উৎকৃষ্ট উপায় সর্ব্বত্র পয়ঃ-প্রণালী-নির্ম্মাণ। এইটী ভারতবর্ষে বিশেষ অভাব। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে ইহার আবশ্যকতা বুঝেন না, তাহা নহে। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্বেত ইঞ্জিনীয়ারগণের উদরের আয়তন এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। পয়ঃ-প্রণালী-নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যত কেন অর্থব্যয় করন না, অধিকাংশই শ্বেত ইঞ্জিনিয়ারদিগের উদরসাৎ হইবে। অবশিষ্ট অর্থে যাহা সম্পন্ন হইবে, তাহাতে এই গুরুতর অভাবের কণামাত্র বিদূরিত হইবে। সুতরাং পয়ঃ-প্রণালী-নির্ম্মাণ দ্বারা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের অনুৎপত্তি-নিবারণের আশাও সুদূর-পরাহত। তবে যদি আমরা এক টাকার কায লইতে পাঁচ টাকা খরচ করিতে পারি, তাহা হইলে, আমাদিগের সে আশা পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু আমরা এত দীন ও দুঃস্থ যে, এক টাকা ব্যয় করাই আমাদিগের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার, পাঁচ টাকার ত কথাই নাই। সুতরাং ধরিয়া রাখিতে হইবে যে, পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ দ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারণের আমাদিগের কোন আশাই নাই।

এই জন্যই বলিতেছিলাম, বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে।

দুর্ভিক্ষের পরিহরণের দুইটী উপায় বলিলাম। এক্ষণে দুর্ভিক্ষের উপশমনের দুই একটী উপায় বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

দুর্ভিক্ষে যদি প্রজানাশ হয়, তাহার জন্য দায়ী কে? আমাদিগের মতে রাজা। যদি ঘোর বিপাকের সময়ে রাজা তাহাদিগের প্রাণরক্ষা

না করিবেন, তাহা হইলে, রাজার সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ কি? কি জন্য তাহারা রাজাকে কর দিবে? কি জন্যই বা তাহারা স্বাধীনতার বিনিময়ে তাঁহার নিকটে অধীনতা কিনিবে? প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা যখন রাজার কর্ত্তব্য স্থির হইল, তখন দেখা যাউক, দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইলে, রাজা কি কি উপায়ে তাহার উপশমন করিতে পারেন।

খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই অভাব দূর করিলে দুর্ভিক্ষের উপশমন হয়। এক্ষণে এই অভাবের দূরীকরণ বণিক্‌বৃন্দ দ্বারাও হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট দ্বারাও হইতে পারে। বণিকেরা নানা দেশ হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে আনয়ন করেন, গবর্ণমেণ্টও ইচ্ছা করিলে তাহা আনিতে পারেন। উভয়েই যদি দ্রব্যাদি আনিয়া উচ্চ মূল্যে বেচিতে বসেন, অতি অল্প লোককেই ভারতে ক্রেতা পাইবেন। কারণ, অর্থ-প্রাচুর্য্য থাকিলে দুর্ভিক্ষের প্রভাব কখনই অনুভূত হয় না। দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষের একটী গৌণ কারণ। এই জন্য আজ্‌কাল ভারতে এত দুর্ভিক্ষ। সুতরাং সে স্থলে বাণিজ্যের স্বাধীনতার যদি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ না করা যায়, যদি দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে, দ্রব্যাদি বিক্রীত হওয়ার কোন আশা থাকে না। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজেই সংযোজক (Supplier) হউন, আর বণিক্‌-বৃন্দই সংযোজক হউন, গবর্ণমেণ্টকে একটা সম্ভবতঃ ন্যূনতম মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। সম্ভবতঃ ন্যূনতম মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে ক্রেতার সংখ্যা বাড়িবে, মৃত্যু-সংখ্যার হ্রাস হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধেও অল্পসংখ্যক কাঙ্গালীর ভার পড়িবে। কিন্তু ইংলিশ্‌ গবর্ণমেণ্টের একটী গুরুতর রোগ আছে। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হইবে সেও ভাল, তথাপি ইহাঁরা বাণিজ্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না।

দুর্ভিক্ষ-প্রশমনের দ্বিতীয় উপায় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রদেশে দুর্ভিক্ষের সময় গুরুতররূপে পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান। যত লোক উপস্থিত হউক্‌ না কেন, পূর্ণ অশনে বা উপযুক্ত বেতনে, তাহাদিগের দ্বারা কায লইলে অনাহার-জনিত মৃত্যু প্রায় ঘটিতে পারে না। অনুপযুক্ত

বেতনে বা অর্দ্ধ অশনে তাহাদিগের দ্বারা ভাল কায লওয়া সম্ভব নহে, এবং অধিক দিন তাহাদিগকে জীবিত রাখাও সহজ নহে। লীটন্ ও টেম্পল্ এই অর্দ্ধ-অশন নীতি অবলম্বন করিয়া অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা আর শুদ্ধ বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টকে গালি দিয়া দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইব না। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের অবস্থা ও সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য—এবং ভবিষ্য দুর্ভিক্ষ সকলের যথাসাধ্য পরিহরণ করিতেই বা আমাদিগকে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা সেই সমস্তের আলোচনা করিব।

মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে রাজার উপর অভিমান করিয়া অনেক তিরস্কার করিলাম—অনেক কাঁদিলাম। কিন্তু তাহাতেই আমাদিগের জাতীয় কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইল না। আমাদিগের জানা উচিত যে, ইংরাজেরা আমাদিগের জেতা অথবা জেতৃত্বাভিমানী। যাঁহাদিগের মনে জেতৃত্বাভিমান প্রবল রহিয়াছে, তাঁহারা যে বিজিত দেশের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য-সাধন—বিজিতদিগের সুখ দুঃখে পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ—করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। যত দিন ইংরাজদিগের মন হইতে সেই জেতৃত্বাভিমান অপনীত না হইবে, যত দিন তাঁহারা আমাদিগকে অসভ্য বিজিত দাসজাতি বলিয়া ঘৃণা করিবেন, তত দিন তাঁহাদিগের কাছে সমদুঃখসুখতা আশা করা বাতুলতামাত্র। স্বাধীন জাতি তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল দাবী দাওয়া করিতে পারেন, আমাদিগের তাহা করিবার অধিকার নাই। আজ্ লর্ড লীটন ও টেম্পল সাহেব অদ্ধাশননীতি অবলম্বন করায়, মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষে পাঁচ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইল। এ

সংবাদে কেন আজ ভারত নীরবে নির্জ্জনে কাঁদিল? ইহার একই উত্তর—ভারত পরাধীন—ভারত বিজিত।

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে সহস্র সহস্র ভ্রাতাভগিনী মরিতে লাগিল, আর আমরা অম্লানবদনে দেখিতেছি—নির্ভাবনায় খাইতেছি! এমন সহৃদয় ব্যক্তি আমাদিগের মধ্যে এক জন আছেন, যাঁহারা দিনের মধ্যে অন্ততঃ এক বারও সেই হতভাগা ও হতভাগিনীদের জন্য ভাবিয়া থাকেন বা এক বিন্দু অশ্রুজল ফেলেন? ইতিহাসের অতীত ঘটনা ও নবন্যাসের কল্পনাসম্ভূত উপাখ্যান আমরা যেরূপ নির্লিপ্ত ও নির্জ্জীব ভাবে পাঠ করি, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের শোচনীয় অবস্থাও আমরা সেইরূপ ভাবে পাঠ করি। তাহাদিগের দুঃখে আমাদিগের জীবন্ত ও জ্বলন্ত সহানুভূতি নাই। তাহা থাকিলে আমরা এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না, আমরা গবর্ণমেণ্টের উপর সমস্ত ভার—সমস্ত দায়িত্ব—চাপাইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতাম না, আমরা শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টকে গালি দিয়া স্বজাতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চাহিতাম না। গবর্ণমেণ্টের স্খলনে—গবর্ণমেণ্টের অনবধানে—গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের অকরণে—যদি দুর্ভিক্ষের ভীষণ পরিণাম ঘটে, প্রথম হইতেই তাহার উপায় স্থির না করিয়া, এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না।

যদি স্বজাতির বিপদে—সহোদর, সহোদরার দুঃখে—আমরা কাতর না হইলাম, তবে বিজাতিতে-বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভগিনীতে—কেন তাহাদিগের দুঃখে, তাহাদিগের বিপদে কাতর হইবে? আমরা সহোদর স্নেহের অভাবের জন্য আপনাদিগকে তিরস্কার করিব না, কিন্তু বিজাতীয়দিগের অন্তরে প্রবল মানব-প্রেমের অভাব দেখিলে তাহাদিগকে তিরস্কার করিব। আমরা রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি পাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিব, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা-ভগিনীর প্রাণরক্ষার্থে তাহার কিয়দংশও দিতে পারিব না। কোন সম্ভ্রান্ত লোক মরিলে আমরা তাঁহার স্মৃতি চিরস্থায়িনী করিবার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা চাঁদা দিতে পারিব, কিন্তু সহস্র সহস্র সহোদর

সহোদরার জীবন-রক্ষার্থে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিতেও কুণ্ঠিত হইব। অতএব আইস, অগ্রে আমরা নিজের দোষ সংশোধন করি। তাহার পর পরকে গালি দিব। অগ্রে আমরা কার্য্যতঃ দেখাই যে, আমরা সমস্ত ভারতবাসী মিলিয়া মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ-নিবারণ জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, তখন যদি দেখি, গবর্ণমেণ্ট তৎপক্ষে উদাসীন, আমরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইব।

এক্ষণে এতৎসম্বন্ধে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে দেখা যাউক, মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষের অবস্থা কি। আমরা স্বচক্ষে কিছুই দেখি নাই, সুতরাং পরোক্ষে যাহা শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি, তাহা হইতেই আমাদিগকে প্রকৃত ঘটনার একটী চিত্র, একটী প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সভার দীনবন্ধু মহাত্মা ডিউক্ অব্ বকিম্হাম্ মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ-বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন,-তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম:—"পূর্ব্বে যেরূপ অনুমান করা গিয়াছিল, দুর্ভিক্ষ এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অন্যতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এরূপ মনে করা গিয়াছিল যে, সাময়িক জলবর্ষণে জনসাধারণ এই আকস্মিক বিপৎপাতের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবে, এবং যে সকল লোক উপশমনকেন্দ্র সকলে সমবেত হইয়াছে, তাহারাও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাহারা এক্ষণে দুর্ভিক্ষের এমন একটী নব কলায় উপনীত হইয়াছে, যাহার প্রতাপ কৃষ্ণা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত প্রদেশে অনুভূত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণার পরিসর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। খাদ্য-সংযোজনা কমিতেছে, গো-মহিষাদি কড়ঙ্গবীয় পালে পালে মরিতেছে, শস্য সকল শুকাইয়া যাইতেছে, অধিক কি, এই প্রদেশ সকলের কষ্ট যন্ত্রণা বাক্যে বর্ণনা করা অসাধ্য। প্রাদেশিক কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য-বিবরণে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এক কোটী অশীতি লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়াছে। তাহাদিগের অবস্থা অতি

শোচনীয়। ইহাদিগকে এক্ষণে প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের দাতব্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কইম্বাটুর, আর্কট্ ও নীলগিরি প্রভৃতি প্রদেশে অনেক সপ্তাহ ধরিয়া যৎসামান্য শস্য-সংযোজনার উপর নির্ভর করিয়া লোকের প্রাণ-ধারণ করিতে হইয়াছিল। এত শস্যের প্রয়োজন যে, যাহা সংগৃহীত হইয়া প্রেরিত হয়, তাহা আসিতে না আসিতেই যেন কোথায় চলিয়া যায়। যদিও এক্ষণে দিন দিন শস্যসংযোজনা বাড়িতেছে, তথাপি এখনও এত শস্যের প্রয়োজন যে, ইহাতেও পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। মহীসুরেরও অবস্থা এত শোচনীয় যে, এখান হইতে শস্য না পাঠাইলে চলিতেছে না। প্রাদেশিক কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য-বিবরণে আরও জানা গেল যে, মান্দ্রাজের কৃষিজীবী প্রজাগণ এই দুর্ভিক্ষে এতদূর ভগ্ন-হৃদয় হইয়াছে যে, তাহারা কৃষিকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, এই শোচনীয় অবস্থা যতদূর সাধ্য নিবারণ করা এবং যাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের সংযোজন ও বিতরণ হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা। যদিও এই কার্য্য নিতান্ত লঘু নহে, তথাপি কর্ম্মচারীদিগের যত্ন ও ভারত-বাণিজ্যের গৌরবে, বৎসরের প্রথমার্দ্ধে অতি কষ্টে কথঞ্চিৎ শস্যসংযোজনা করা গিয়াছিল। কিন্তু এক মাস পূর্ব্বে হঠাৎ দেখা গেল যে, এক সপ্তাহের বই খাদ্যসামগ্রী নাই। শস্যের মূল্য সুতরাং অসম্ভব বাড়িয়া উঠিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় বাঙ্গালা এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে বণিক্‌দিগের অসাধারণ অধ্যবসায়ে প্রচুর শস্য আসিয়া পড়িল। কিন্তু খাদ্যাভাবই এখানকার প্রজাদিগের একমাত্র কষ্ট নহে। আমি এক বার প্রদেশের অভ্যন্তরে নির্গত হইয়া দেখিলাম যে, প্রজাদিগের পরিধানবস্ত্র নাই, চালের খড় দিয়া অনাহারে মরণোন্মুখ গোমেষাদির উদরপূরণ করা হইয়াছে। এ শোচনীয় দৃশ্যে পাষাণও বিগলিত হয়। গবর্ণমেণ্ট সাহায্যে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাদিগের সমস্ত অভাব পূরণ হওয়া দুষ্কর। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কোন খানেই প্রফুল্লতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না, প্রত্যুতঃ সর্ব্বত্রই দুঃখ যন্ত্রণা ও অভাব

উপলক্ষিত হয়। দীন ও দরিদ্র প্রজাদিগের তৈজস পাত্র বিক্রীত হইয়াছে, তাহাদিগের শেষ আশা—শস্যভাণ্ডার—ফুরাইয়াছে। তাহারা সমীপবর্ত্তী উপশমন-শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদিগকে স্ব স্ব গ্রামে রাখিবার কোনপ্রকার প্রলোভন বস্তুই নাই। নূতন তৈজস পাত্র, গো-মেষাদি ও অঙ্গাচ্ছাদন ক্রয় করিতে এবং ঘরের চাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে প্রজাদিগের যে ব্যয়ের আয়োজন, গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার সমস্ত নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। এই জন্য আমরা ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের নিকটে অর্থ-সাহায্য চাহিতেছি। তাঁহাদের নিকটে দুর্ভিক্ষের প্রকৃত অবস্থা ও প্রজাদিগের দুঃখ যন্ত্রণা শুদ্ধ ব্যক্ত করিলেও প্রচুর অর্থ সাহায্য আসিবে। যখন ইংলণ্ডের জনসাধারণ শুদ্ধ জানিতে পারিবেন যে, ভারতের যে খণ্ড দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হইয়াছে, তাহার পরিসর ইংলণ্ড অপেক্ষাও অধিকতর, যখন তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, ইংলণ্ডে ভীষণতম দুর্ভিক্ষের সময়েও শস্যের মূল্য যেরূপ বাড়িয়াছিল, এখানে শস্যের মূল্য তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দাঁড়াইয়াছে, এবং ভারতেও পূর্ব্বে কখন শস্যের মূল্য এতদূর বাড়ে নাই, তখন সাহায্য আপনিই আসিয়া জুটিবে। বিগত দুর্ভিক্ষের সময়ে বঙ্গদেশে শস্যের মূল্য যেরূপ বাড়িয়াছিল, মান্দ্রাজে এ বৎসরে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক বাড়িয়াছে। সমস্ত মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির তিন ভাগের এক ভাগ এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়াছে। এই অভাব বিদূরিত করা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সাধ্যাতীত, এই জন্য আমাদিগের অন্যান্য প্রেসিডেন্সির নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইতেছে।"

আমরা ডিউক্ অব্ বকিংহামের হৃদয়বিদারক বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম ; এক্ষণে মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত ডাক্তার কর্ণিস্ বেল্লারী ও কার্ণুল্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে বিবরণ দিয়াছিলেন, পাঠকদিগের গোচরার্থ তাহার এক স্থানের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—তিনি প্রজাদিগের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। তাহারা কঙ্কালমাত্রে পরিণত হইয়াছে, এবং

দলে দলে উপশমন-শিবিরে বা অনাথ-নিবাসে গমন করিতেছে। দুর্ভিক্ষের ভীষণতার এই আরম্ভ-মাত্র। দিন দিন দুর্ভিক্ষের পরিসর বাড়িতেছে। শুষ্ক শস্যের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতেছে। শীঘ্র যে উপশমন হইবে, তাহারও কোন আশা নাই। প্রজাসাধারণ এখন প্রদেশান্তরানীত শস্যের উপরই নির্ভর করিতেছে, এবং আগামী জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই প্রদেশান্তরানীত শস্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। অদ্যাপি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই, এবং অচিরাৎ পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি না হইলে কৃষ্ট ভূমিতে চাষের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আগামী পাঁচ ছয় মাস দুর্ব্বিষহ কষ্ট যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। সেই ভীষণ সময়ে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তি-দিগকে শমন-সদন হইতে রক্ষা করিবার জন্য, গবর্ণমেণ্টকে ও জনসাধারণকে বদ্ধপরিকর থাকিতে হইবে।

সিবিল্ এবং মিলিটরী গেজেটের মান্দ্রাজ পত্রপ্রেরক মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারও মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"চতুর্দ্দিকে খৃষ্ট উপাসকমণ্ডলী বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা উপাসনায় বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করিতেছেন না। অথচ তাঁহারা এই দুর্ভিক্ষের ও এই মহামারীর অভ্যন্তরে উদ্দীপনার যথেষ্ট সামগ্রী পাইতে পারেন। এই উপাসকমণ্ডলীর স্তোত্রে অদৃশ্য মানবশত্রু শয়তানের কথা অনেক শুনা যায়; কিন্তু মানবজাতির প্রত্যক্ষপরি-দৃশ্যমান শত্রু যে পীড়া, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু প্রভৃতি—তাঁহাদিগের স্তোত্র-সকলে তাঁহাদের ত কোন উল্লেখই দেখিতে পাই না।

"উৎকৃষ্ট চাউলের অভাবে ও শস্যের উচ্চ মূল্য-নিবন্ধন চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিয়াছে। কোচিন হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহা সাতিশয় মর্ম্মোপঘাতী। বেল্লারীর অবস্থা আরও শোচনীয় এবং ইহা অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা। সমস্ত মান্দ্রাজের অবস্থা ইহা অপেক্ষা আরও শোচনীয়তর দাঁড়াইবে। ইহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় ফাটিয়া যায়। আমি এক জন উপশমন-কর্ম্মচারীর

মুখে শুনিলাম যে, লোকে অনাহারে এরূপ উন্মত্ত ও কাণ্ডাকাণ্ডশূন্য হইয়াছে যে, দুই সহস্র কুলি অকারণে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি অতি কষ্টে তাহাদিগের হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া আসিয়াছেন, তিনি বলিলেন 'এক দিন আমি ভ্রমণে যাইবার সময়ে দেখিলাম, দ্বাদশ জন ব্যক্তি মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের মাংসাদি শৃগাল কুকুরে ভক্ষণ করিয়াছে, কয়খানি কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, শৃগাল কুকুরে সমাধি-নিহিত মানব-দেহ উত্তোলিত করিয়া ভক্ষণ করিতেছে।' কল্য প্রত্যূষে মান্দ্রাজ-নগরে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদের রেলে পৃষ্ঠ দিয়া একটী কঙ্কাল মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।"

এইরূপ অসংখ্য লোমহর্ষণ বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমরা ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জড়ের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছি।

আমরা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলাম যে, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ উপশমিত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগত আমাদিগের এক জন বন্ধুর নিকট অন্যপ্রকার শুনিয়া শোকে অধীর হইলাম। তিনি দুর্ভিক্ষ-চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন যে, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ কিছুমাত্র উপশমিত হয় নাই। যত দূর দৃষ্টি চলে, চতুর্দ্দিকেই মৃতদেহ অথবা অর্দ্ধমৃত কঙ্কাল পরিদৃষ্ট হয়। শয্যাগত না হইলে পরিশ্রমের বিনিময় ব্যতীত উপশমন-শিবিরে কোনপ্রকার সাহায্য পাইবার আশা নাই। পরিশ্রমের বিনিময়েও যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহাও অতি সামান্য—প্রত্যেক ব্যক্তি ছয় পয়সা পরিমাণে। আমরা আশ্চর্য্য হইলাম যে, টেম্পেল সাহেবের অর্দ্ধাশন-নীতি অদ্যাপিও পরিত্যক্ত হয় নাই। যেখানে চাউল টাকায় আড়াই সের করিয়া, সেখানে ছয় পয়সায় এক পোয়া পরিমিত চাউলও পাওয়া যায় না। অর্দ্ধ সের চাউলের কমে দুই বেলা এক জনের চলিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন কিছু উপলক্ষ চাই। সুতরাং ন্যূনতঃ চারি আনার কমে ঐরূপ দুর্ভিক্ষের সময়ে এক জনের

চলিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধাশনে মান্দ্রাজবাসীদিগকে কঙ্কালাবশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে তাহারা এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে, ইংলণ্ডের অসামান্য বদান্যতাও বুঝি তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিল না। যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আর ছয় মাস পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের নিকটে আপনাদিগের অক্ষমতা জানাইয়া সাহায্য-প্রার্থী হইতেন, তাহা হইলে, মান্দ্রাজ আজ মরুভূমি হইত না। ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের অলোক-সামান্য বদান্যতা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই অক্ষালনীয় পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে বটে, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্বকৃত পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের অতি অল্পই উপকার হইতেছে। আমরা প্রত্যাগত বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে, দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ এরূপ অবস্থায় আনীত হইয়াছে যে, কোন দৈবী শক্তির সাহায্য ব্যতীত তাহাদের জীবনরক্ষা কিয়ৎপরিমাণে অসাধ্যসাধন হইয়া উঠিয়াছে। বহু কালের অনশনে বা অর্দ্ধাশনে তাহাদের পাকস্থলী এরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে যে, শুদ্ধ অন্নও তাহারা জীর্ণ করিতে পারে না। অন্ন পাইতেছে, আর ওলাউঠারোগে আক্রান্ত হইতেছে। উপশমন-শিবিরে এই জন্য প্রধানতঃ অন্নের কাঁজি বিতরিত হইতেছে। অন্ন জীর্ণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহাদের অন্ন-স্পৃহা এতদূর বলবতী হইয়াছে যে, কোন পথিক অন্নাহার করিতেছে দেখিলে অসংখ্য দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করে এবং তাঁহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে। আমাদিগের মান্দ্রাজ-প্রত্যাগত বন্ধু এক দিন কোন রেলওয়ে-ষ্টেশনের সমীপবর্ত্তী বাজারে গমন করিয়া দেখেন যে, তথায় অর্দ্ধ-কাঁকর-মিশ্রিত মোটা চাউল টাকায় আড়াই সের করিয়া, কাঁচা লঙ্কা ও প্যাজ-মাত্র রহিয়াছে, আর কিছুই নাই। তিনি সে সকল লইয়াই কথঞ্চিৎ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে অসংখ্য দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত আসিয়া তাঁহার অন্নাগারের দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদিগের কাতরস্বরে ব্যথিত হইয়া তিনি অন্ন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন,

এবং ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। অমনি তাহাদিগের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সকলেই সেই অন্নের প্রার্থী। পরস্পর সংঘর্ষে সেই তণ্ডুলরাশি ধূলায় পতিত হইল। অবশেষে সেই ধূলি-বিমিশ্রিত তণ্ডুল সকলেই এক একটী করিয়া খুঁটিয়া খাইতে লাগিল। আমাদিগের বন্ধু অভুক্ত ও অনিদ্রিত অবস্থায় অতি কষ্টে তথায় রাত্রিযাপন করিয়া প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন যে, রাত্রিতে যে সকল কঙ্কাল তাঁহার আহার কাড়িয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ধরায় পতিত রহিয়াছে। এইরূপ ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার নয়নগোচর হইত। উপশমন-শিবির সকল এত দূরে দূরে অবস্থিত যে, এই সকল অর্দ্ধমৃত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণ যে, তথায় হাঁটিয়া গিয়া সাহায্য লইবে, তাহার কোন আশা নাই।

এইরূপ ভীষণ অবস্থায় আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? ইংলণ্ড অসামান্য বদান্যতা প্রদর্শন করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা সে বদান্যতার এখনও একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। কোন শ্বেতাঙ্গের উপাসনার জন্য আহুত হইলে তাঁহারা এত দিন অজস্র মুদ্রা বর্ষণ করিতেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ্ তাঁহারা অসংখ্য ভ্রাতা ভগিনীগণকে কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার শতাংশের একাংশ পরিমাণেও অর্থব্যয় করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। গবর্ণমেণ্ট যদি এই কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের নিকট অর্থ-সাহায্য চাহিতেন, তাহা হইলে, এত দিনে স্রোতঃসহস্রে চতুর্দ্দিক্ হইতে অর্থরাশি আসিয়া উপস্থিত হইত, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিশ্চয় বিশ্বাস হইত যে, সে অর্থের বিনিময়ে তাঁহারা অবশ্যই রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি ও রাজসম্মান পাইতে পারিবেন। কিন্তু অনাহূত দানে তাঁহাদিগের সে আশা-পূরণের সম্ভাবনা কোথায়? আজ্ সে আশা নাই বলিয়াই ভারত নিশ্চেষ্ট, ভারত জড়পিণ্ডের ন্যায় এই ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার স্থিরভাবে দেখিতেছে।

রাজসম্মান পাইবার জন্য বা গবর্ণমেণ্টের প্রীতিভাজন হইবার জন্য দিল্লীর দরবার ও যুবরাজের আগমন-উপলক্ষে প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে ও প্রতি গৃহে উৎসবে কত লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে; কিন্তু আজ্ লক্ষ লক্ষ ভ্রাতৃ-ভগিনী মরিতেছে, আর আজ্ কিনা ভারত নীরব, ভারত নিশ্চেষ্ট।

ভ্রাতা-ভগিনীর মৃত্যুতে সমস্ত তুরস্ক ও সমস্ত রুশিয়া গভীর শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছে; আবাল-বৃদ্ধ বনিতা কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে, রমণীরা বসন ভূষণ ও বিলাস-দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়াছে, বীরবৃন্দ অধরে হাস্য পরিত্যাগ করিয়াছেন; সমস্ত উৎসব আনন্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে—তথাপি রুশ্ রুম্ যুদ্ধে মৃত্যুসংখ্যা অদ্যাপি এক লক্ষ অতিক্রম করে নাই। কিন্তু আজ্ সমস্ত মান্দ্রাজ-বাসী মৃত বা অর্দ্ধমৃত—স্থাবর না জঙ্গম কঙ্কাল—কিন্তু ভারত কি শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন? আমরা দুর্গোৎসবের উৎসাহ ত এবৎসর কিছু কম দেখিতেছি না। সমস্ত ভারতবাসী দুর্গাপূজার উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা যদি এক দিনও মান্দ্রাজের জন্য এরূপ শোকোন্মাদ দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও ভাবিতাম, ভারতের আশা আছে, তাহা হইলেও ভাবিতাম, স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের স্ফুলিঙ্গও ভারত-শরীরে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কিন্তু যখন এক অঙ্গে এরূপ গুরুতর আঘাত লাগাতেও ভারতের চৈতন্য হইল না, অঙ্গান্তরে যাতনা অনুভূত হইল না, তখন আর ভারতের কি আশা?

ভারতবাসিগণ! এখনও মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করুন্। যে শ্বেতাঙ্গ জাতিকে আপনারা বিজেতা বলিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন, তাঁহাদিগের উদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন্। মান্দ্রাজের সহিত তাঁহাদিগের জেতৃবিজিত ভাবে মাত্র সহানুভূতি। তাহাতেই তাঁহাদিগের বদান্যতা সহস্র স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। যে জাতি শত শত যোজন দূরে সাগর-পারে অবস্থিত, এবং জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণে বিভিন্ন হইয়াও, বৈদেশিক বিজিতগণের দুঃখে এত দূর কাতর হইতে পারেন, সে জাতি-

চরণে আমাদিগের কোটী কোটী নমস্কার। কিন্তু যে জাতি অদূরে অবস্থিত, এক মাতৃভূমির ক্রোড়ে লালিত, এবং জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণে অভিন্ন, ভ্রাতা ভগিনীগণের দুঃখে ও মরণে উদাসীন—সে জাতি জগতের ঘৃণার পাত্র, সে জাতির ভার বসুন্ধরারও অসহ্য। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ! যদি দুরপনেয় কলঙ্কের অপনয়ন করার ইচ্ছা থাকে, তবে আসুন, আমরা সমস্ত ভারতবাসী অসংখ্য মান্দ্রাজবাসী ভ্রাতা-ভগিনীদিগের অনশনের জ্বালা অনুভব করিবার জন্য অন্ততঃ এক দিনও উপবাস করি। তাহা হইলে, আমাদিগের অসঙ্কুচিত সহানুভূতি উদ্দীপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবাসীর এক দিনেরও আহার মান্দ্রাজে প্রেরিত হইয়া অসংখ্য প্রাণীর প্রাণরক্ষা করিবে।

মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলেও ভারতে প্রায় ১৬ কোটী লোকের বাস। প্রত্যেক ব্যক্তি এক দিনের আহারের মূল্য গড়ে।০ আনা করিয়া ধরিলেও ষোল কোটী লোকের আহারের মূল্য চারি কোটী হয়। চারি কোটী টাকা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে উপশমনে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে, অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ-রক্ষা হইতে পারে। বেতনভুক্ অর্থগৃধ্নু গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর হস্তে সেই অর্থভার সন্ন্যস্ত না করিয়া যদি কতিপয় অবৈতনিক ধৃতব্রত মনীষীর হস্তে এই কার্য্যের ভার অর্পণ করা যায়, তাহা হইলেই, প্রকৃত ফল-লাভের সম্ভাবনা। এই বিশাল ভারতক্ষেত্রে—যেখানে পারলৌকিক ধর্ম্মের জন্য অসংখ্য মনীষী সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেছেন, অসংখ্য মনীষী অতীত-মানব আত্মত্যাগ করিতেছেন—সেই বিশাল ভারতক্ষেত্রে কি এমন এক সহস্র মনীষীও দুর্লভ—যাঁহারা ঐহিক ধর্ম্মের জন্য—অসংখ্য ভ্রাতা-ভগিনীর প্রাণরক্ষার জন্য—অন্ততঃ তিন মাসের জন্য দুর্ভিক্ষ উপশমনরূপ পবিত্রতম ও গুরুতম ব্রত গ্রহণ করেন? শাক্যসিংহ ও চৈতন্যের জন্মভূমি কি সন্ন্যাসিশূন্য হইবে? একথা বিশ্বাস হয় না! একথা ভাবিতেও কষ্ট হয়।

আর ভারত বিরাগণ। আপনাদিগের চিরব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্যাপনের এমন সুযোগ আর কখন ঘটিবে না। আপনারা পুণ্য কার্য্যের

অনুষ্ঠানের জন্য কখন অভিভাবকদিগেরও মুখাপেক্ষা করেন না। কাশী, গয়া, জগন্নাথ প্রভৃতি গমনের সময় সহস্র সহস্র বাধা বিপত্তিও আপনাদিগের গতি-রোধ করিতে সক্ষম হয় না। তীর্থ পর্য্যটনের জন্য আপনারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও সঙ্কুচিত হন না। মান্দ্রাজের ন্যায় তীর্থস্থল আপনাদিগের ভাগ্যে আর কখন জুটিবেক না। আপনারা দলে দলে চির-সঞ্চিত সম্বল সহ তথায় উপস্থিত হউন্। আপনাদিগের স্নেহময় করস্পর্শে অসংখ্য বালক বালিকা, অসংখ্য যুবক যুবতী, ও অসংখ্য বৃদ্ধ বৃদ্ধা অনুপ্রাণিত হইবে। আপনাদিগের দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের অন্তরে আবার জীবনাশা উদ্দীপিত হইবে। তাহারা যে এক্ষণে শুদ্ধ আহার প্রার্থী এরূপ নহে, শুশ্রূষা এক্ষণে তাহাদিগেরও জীবন-রক্ষার প্রধান উপযোগী। যখন বিংশ সহস্র তুরস্ক রমণী আহত তুরস্ক সৈন্যগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত সমরক্ষেত্রে গমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের আদর্শ-ভূমি ভারতক্ষেত্রে কি অন্যূন এক সহস্রও ব্রতধারিণী পাওয়া যাইবে না? পাওয়া যাইবে না—আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস হয় না। আমাদিগের বিশ্বাস—এই ব্রতের গুরুত্ব তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলেই, তাঁহারা অকুতোভয়ে ইহাতে আত্মসমর্পণ করিবেন।

এইরূপ অসংখ্য ব্রতধারিণী মনীষিণী ও অসংখ্য ব্রতধারী মনীষী দেশীয় কোন হস্তে মান্দ্রাজ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে, আর মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ-উপশমনের কোন আশা নাই। গবর্ণমেণ্ট নিজ কর্ম্মচারীদিগের রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিয়া প্রচার করিতেছেন যে, মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ অনেক পরিমাণে উপশমিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, দুর্ভিক্ষের কিছুমাত্র উপশমন হয় নাই। উপশমন-কেন্দ্র সকল এত দূরে দূরে অবস্থিত, যে অভ্যন্তর-স্থিত অধিবাসীরা সে সকলের কোনও সাহায্য পাইতে পারে না। তাহারা অনশনে ও বিনা শুশ্রূষায় আপন আপন কুটীরে সমাধি-নিহিত হইতেছে। এইরূপে কত লোক মরিতেছে, গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার

সংবাদ পর্য্যন্তও আসিতেছে না। উপশমন-কেন্দ্র সকলের মৃত্যু সংখ্যা লইয়াই প্রায় গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের মৃত্যু-সংখ্যা নির্ণয় করিতেছেন।

আমাদিগের অভীপ্সিত ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীগণ জাতীয় ভাণ্ডার হস্তে সেই সকল অভ্যন্তরবাসী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের শুশ্রূষায় নিরত হউন। যদি তাঁহারা এক শতের মধ্যে এক জনকেও বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলেও, তাঁহাদিগের পুণ্যের ইয়ত্তা নাই।

ভারতবাসী ধনিবৃন্দ! আপনারা গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ মুমূর্ষু সময়ে নিদ্রিত থাকিবেন না। অক্ষয় কীর্ত্তি-সঞ্চয়ের এমন সুবিধা সহসা পাইবেন না। আপনাদিগের অর্থের সদ্ব্যয়ের এরূপ সুযোগ সহসা জুটিবে না। আপনারা ইংলণ্ডের ধনিবৃন্দের অত্যুদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করুন্। আর্য্যনামের গৌরব রক্ষা করুন্। ভারতের একাঙ্গ রসাতলে যাইতেছে—তাহার উদ্ধার সাধন করুন্।

ভারত-সভা।*

যখন ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমরা 'ভারতের ভাবী পরিণামে' ইহার ভাবী পরিণাম কি হইবে, অগ্রেই বলিয়া দিয়াছিলাম। অধুনা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন-সমাজ-বন্ধন, অসংখ্য-ভাষাকথনশীল ও নানা-পরিচ্ছদ-পরিশোভিত ভারতের মিশ্র অধিবাসিবৃন্দের পরস্পর-মিলনের একমাত্র উপায় 'ভারত-সভা'। আমরা প্রথম হইতেই ইহার যে গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম, ইহা ধীর ও নিশ্চিত পদবিক্ষেপে ঠিক সেই গতি-পথে চলিতেছে। সমস্ত ভারতকে একটী কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক সমাজের সহিত গ্রথিত করিতে, ইহা বিবিধ চেষ্টা ও উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। ইহার প্রচারকগণ নানা স্থানে গিয়া উদ্দীপনা-বাক্যে তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দকে কেন্দ্রীভূত

* The Third Annual Report of the India Association, 1878–79.

সভার সহিত সূত্রবদ্ধ করিতেছেন। সমস্ত ভারত যেন ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে। কলিকাতা, এলাহাবাদ, লাহোর, বোম্বে ও মান্দ্রাজ—যেন এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইতেছে। এ সূক্ষ্ম সূত্র সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন এখনও সকলে দেখিতে পাইতেছেন না বটে, কিন্তু কালে যখন ইহা স্থূলতর ও বন্ধন-গাঢ়তর হইবে—তখন ইহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইবে। ভারত-সভা বিলাতের হাউস্ অব্ কমন্সের প্রতিরূপ; এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ সভা হাউস্ অব্ লর্ডের প্রতিরূপ। যখন ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন হাউস্ অব্ কমন্সের অস্তিত্ব ছিল না। ইংলণ্ডের রাজারা কোন বিষয়ে কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, কেবল ব্যারণ্ বা ভূম্যধিকারিগণকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিতেন। লোকসাধারণের প্রতিনিধিগণকে তাঁহারা পরামর্শ করিবার যোগ্য-পাত্র বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু প্রকৃতির গতি কে রোধ করিতে পারে? অসংখ্য লোকের সুখ-দুঃখের নিয়মন অতি অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে থাকা অস্বাভাবিক। তাহাতে অবিচার ও পক্ষপাত হইবেই হইবে। অসংখ্য লোকের রক্তশোষণ করিয়া অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা পরিবার অস্বাভাবিকরূপে পরিতুষ্ট হইবে এবং সাধারণ লোক অনাহারে জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর হইবে, এইরূপ অবস্থা অধিক দিন চলিতে পারে না। লোকে বহুকাল নিমীলিত নেত্রে থাকিতে পারে না। ক্ষুধার জ্বালায় ও অবিচারের কশাঘাতে তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। তখন অন্তর্বিপ্লব অনিবার্য্য। এইরূপ নিরন্তর অন্তর্বিপ্লবে ইংলণ্ডীয় রাজাগণ ক্রমেই অপহৃত প্রাকৃতিক স্বত্ব সকল পুনঃ-প্রাপ্ত হইতেছেন। হাউস্ অব্ কমন্স টিউডার রাজবংশীয়গণের সময় পদে পদে অপমানিত ও তিরস্কৃত হইত। সেই হাউস্ অব্ কমন্সই এখন ইংলণ্ডে সর্ব্বে-সর্ব্বা। এখন ইহার প্রতাপে হাউস্ অব্ লর্ডস্ কম্পিত কলেবর। অচিরকাল-মধ্যেই বোধ হয় হাউস্ অব্ লর্ডস্, হাউস্ অব্ কমন্সের কুক্ষিগত হইবে। আমেরিকাতে হউস্ অব্ কমন্স ও হাউস্ অব্ লর্ডস্ বলিয়া দুইটী স্বতন্ত্র সভা নাই। একটীমাত্র সভা সমস্ত জাতির প্রতিনিধি!

ইহাতে সকল শ্রেণীর লোকই সমান ভাবে বসিয়া স্বদেশের মঙ্গল-সাধন ও ব্যবস্থাপন-কার্য্য-সম্পাদন করিয়া থাকেন। ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্টও এই আদর্শে সংগঠিত হইয়াছে। এই বিশ্বজনীন সাম্যের ভাব সর্ব্ব প্রথমে ফ্রান্সেই আবির্ভূত হয়। ফ্রান্স হইতে আমেরিকায় যাইয়া পরিশোধিত হইয়া আবার বিশুদ্ধ অবস্থায় ফ্রান্সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে আমেরিকা ও ফ্রান্সের আদর্শে গঠিত করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। কত দিনে তাঁহারা যে, কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক, যখন সভ্যতায় অধিকতম সমুজ্জ্বল জাতি-সকল বৈষম্যের ভিত্তিভূমি-স্বরূপ ব্যবস্থাপক ও নিয়ামক সভার ঐকতানিকতা সম্পাদন করিয়াছেন বা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তখন ভারতবর্ষ সেই, পরিত্যক্ত সৌধের উপর রাজনৈতিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে কেন ইচ্ছা করিতেছেন? যখন বিশ্বজনীন একতার নিতান্ত প্রয়োজন, তখন জমিদারগণ লৌকিক সমাজের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে স্বীকৃত না হন কেন? দাসগণের মধ্যে আবার ছোট বড় ভেদ কেন? জমিদারগণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা নামক একটী স্বতন্ত্র সভা না রাখিয়া ভারতসভার সভার সহিত সম্পূর্ণ মিলিত হইলে, জাতীয় উদ্দীপনা-কার্য্য কত শীঘ্র সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা বোধ হয়, তাঁহারাও বুঝেন। তবে আর কেন বৃথা অভিমান-ভরে এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্য করিয়া আপনাদিগের কার্য্যকরণশক্তির অপব্যবহার করেন। তাঁহাদিগের অর্থ লোকতান্ত্রিক দলের অধ্যবসায় ও উৎসাহবত্তা একত্র সম্মিলিত হইলে, জাতীয় সমন্বয়-কার্য্য অতি শীঘ্র সম্পাদিত হইতে পারে। ভারতসভার অধ্যবসায় ও উৎসাহ অমিত, কিন্তু ইহার অর্থ নাই। জমিদারসভার অর্থ আছে, কিন্তু তত দূর উৎসাহ অধ্যবসায় নাই। এই দুই একত্র মিলিত হইলে ভারতের আর কি অভাব? প্রজাগণের সহিত—জনসাধারণের সহিত জমিদার-গণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদিগের উচ্ছেদ বৈ মঙ্গল নাই। লোকসাধারণ তাঁহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবে, কিন্তু

তাঁহারা কখন লোকসাধারণের উচ্ছেদ-সাধন করিতে পারিবেন না। ভারতসভা সর্ব্বশুদ্ধ পোনরটী শাখা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বারটী বঙ্গে, দুইটী উত্তর-পশ্চিম-বিভাগে ও একটী পঞ্জাবে। মান্দ্রাজ ও বোম্বে এখনও ভারত-সভার অন্তর্ভুক্ত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা সকল সাধারণ-বিষয়েই ভারত-সভার সহিত ঐকতানে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের সহানুভূতির অপ্রতুল নাই। তবে তাঁহারা প্রাদেশিক অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া এখনও মাধ্যমিক সমাজের অধীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, ভারতে পূর্ণ একতা সংস্থাপিত করিতেহইলে, আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কোন মাধ্যমিক সভার অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। জাতীয় শক্তির কেন্দ্রীকরণ ভিন্ন জাতীয় শৃঙ্খলা ও একতা সম্ভবপর নয়।

গত বৎসর ভারতসভা কয়টী গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফলে আমরা সর্ব্বপ্রকার উচ্চ পদ হইতে বঞ্চিত। কোন বিভাগেরই শীর্ষস্থানীয় হইতে আমাদিগের কোন অধিকার নাই। যেন বিধাতা আমাদিগকে শ্বেত পুরুষের অধীন হইয়া থাকিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। রোম যখন গ্রীসের স্বাধীনতা হরণ করেন, তখন গ্রীসেরও এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। গ্রীকেরা বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যে রোমীয়গণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি অতি সামান্য সামান্য কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকিত মাত্র। আমরা বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যে ইংরাজদিগের শ্রেষ্ঠ না হই, সুশিক্ষিত দলের অনেকেই তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। যদি সিবিল্ সার্ব্বিস্ পরীক্ষা ভারতে গৃহীত হইত, যদি ইংরাজদিগকে ভারতে আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী কভেনেণ্টেড্ সার্ব্বিস্ একচেটিয়া করিয়া লইত। বিলাতে পরীক্ষা গৃহীত হওয়ায়, সে সার্ব্বিসের দ্বার অধিকাংশেরই নিকট রুদ্ধ হইয়া ছিল। দুই চারি জন করিয়া প্রতি বৎসর সার্ব্বিসের জন্য যাইতেছিল। তাহারা প্রায় অধিকাংশই দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকল হইতে পরিক্ষিপ্ত।

যাহা হউক, পূর্ব্বে বয়সকাল একবিংশতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তবু দুই চারি জন করিয়া প্রতি বৎসর যাইতেছিল, এবং তাহার মধ্যে অনেকেই কৃতকার্য্যও হইতেছিল। কিন্তু এখন বয়সকাল অষ্টাদশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার অর্থ, ভারতবার্ষীয়দিগকে আর কভেনেণ্টেড্ সার্ব্বিস্ দেওয়া হইবে না; কারণ কোন্ অভিভাবক সপ্তদশবর্ষীয়, একাকী ও অসহায় বালককে সেই দূর দেশে প্রেরণ করিবেন? সুতরাং সে দ্বার ভারতবাসিগণের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে।

স্থিতিশীল গবর্ণমেণ্ট ব্যথিত ভারতবাসিগণকে ভুলাইবার জন্য একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,"ভারতবাসিগণকে অনেক অর্থ ব্যয়ে ও জাতীয় নির্য্যাতন সহিয়া বিলাত গমন করিতে হয়। লাভের সহিত তুলনায় যে ক্ষতি হয়, তাহার পূরণ হয় না। অতএব এখন হইতে তাহাদিগকে আর সে কষ্ট লইতে হইবে না। এখন হইতে ভারতে থাকিয়াই তাহারা অভীষ্টলাভ করিবে।" এই কথায় প্রথম প্রথম অনেকেই ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতসভা তাহাতে ভুলিবার নন। ভারত-সভা জানিতেন, ইহারই অভ্যন্তরে কোন গূঢ় অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন আছে; তাঁহারা জানিতেন যে, আন্দোলনকারিগণের মুখবন্ধ করিবার নিমিত্তই তাঁহারা এই সাময়িক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন যে, দুই একটী অযোগ্য পাত্রে সেই উচ্চ কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া তাহারা অক্ষম হইলে, তাহাদিগের অক্ষমতা লইয়া তাঁহারা বিশেষ আন্দোলন করিবেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন যে, ভারতবাসী এখনও উচ্চ পদের যোগ্য হয় নাই। এই জন্য ভারত-সভা প্রথম হইতেই এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা অনুগ্রহ চাহেন না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাহেন। কারণ, তাঁহাদিগের মতে অনুগ্রহলব্ধ সৌভাগ্য, জাতীয় অধঃপতনের লক্ষণমাত্র। বিজেত্রী জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সমরে অবতীর্ণ হইয়া বিজয়ী হইয়া—তাঁহারা জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে চাহেন। এই জন্য তাঁহারা স্থিতিশীল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পার্লেমেণ্টে আবেদন করিবার নিমিত্ত এক জন প্রতিনিধি

পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। সকলেই জানেন, প্রসিদ্ধনামা লালমোহন ঘোষ সেই প্রতিনিধিত্ব-পদে অভিষিক্ত হন। প্রতিনিধি পাঠাইতে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহার জন্য ভারতসভাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মদেশ সমস্ত ভারত একবাক্যে ভারতসভার এই উদ্যোগের অনুমোদন করেন। ইহার ফল আর কিছু না হউক, ভারতের গ্রন্থন-সূত্র স্থূলতর হইয়াছে। ভারত যে একতানে কার্য্য করিতে পারেন, তাহার প্রমাণ হইয়াছে।

ভারতসভা দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাযন্ত্রবিধির বিরুদ্ধে সবিশেষ আন্দোলন করিয়া উন্নতিশীল দলের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। স্থিতিশীল দল ভারতে কিরূপ অপ্রিয় হইয়াছিলেন, ভারত-সভা এরূপ আন্দোলন না করিলে ইংলণ্ডের নির্ব্বাচকেরা কিছুতেই তাহা জানিতে পারিতেন না; তাহা হইলে, নির্ব্বাচন-কালে তাঁহাদিগের হৃদয় কোন্ দিকে লীন হইত, কে বলিতে পারে? মুদ্রাযন্ত্র-বিধির ব্যবস্থাপনের পর ভারত-সভা ভারতের গগন বিদারিয়া এইরূপ আন্দোলন না করিলে, ইহার পরিশোধন হইত কি না সন্দেহ। তাহা না হইলে সেই কঠোর বিধি কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া দেশ রসাতলে দিতে, সাহিত্য-রাজ্য ছার-খার করিত সন্দেহ নাই।

ভারত-সভা আফ্‌গান-যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধে ন্যস্ত করা ন্যায়-বিগর্হিত—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া পার্লেমেণ্টে আবেদন করেন। ভারত-সভার ক্রন্দনে পার্লেমেণ্টের হৃদয় কাঁদিয়াছে কি না জানি না; তবে বস্তুতঃ এই উপকার হইয়াছে যে, সেই মহতী সভার সভ্যেরা এখন জানিতে পারিয়াছেন, ভারতবাসীরা অন্তরের দুঃখ সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে। সম্মুখে কাতরস্বরে কাঁদিলে অতি পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়। এক বার দুই বার তিন বার—সে ক্রন্দন উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু চতুর্থ বারে সে ক্রন্দন না শুনিয়া আর থাকিতে পারে না। সুতরাং এইরূপ বারবার ক্রন্দন করিতে করিতে আমরা এক দিন নিশ্চয়ই সিদ্ধকাম হইব।

আমরা, বোধ হয়, অনেকেই জানি, আমাদের লজ্জানিবারণের জন্য ইংরাজেরা আমাদিগের দেশ হইতে তুলা লইয়া গিয়া কাপড় বুনিয়া আমাদিগের জন্য ভারতে আনিয়া থাকেন। ইংরাজেরা আমাদিগকে কাপড় না দিলে, আমাদিগকে উলঙ্গ থাকিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের লজ্জার বিষয় আর কি কিছু আছে? জাতীয় অধঃপতনের ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু অপ্রিয় হইলেও ইহা অকাট্য সত্য যে, আমরা এ বিষয়ে অতি অসভ্য জাতিরও অধম। ইংরাজেরা কলে কাপড় বুনিতে পারেন বলিয়া আমাদিগের তন্তুবায়গণ অপেক্ষা অনেক সস্তায় কাপড় দিতে পারেন। এই জন্যই আমাদিগের তন্তুবায়কুল ক্রমেই নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। ভারতের তন্তুবায়কুলকে রক্ষা করিবার জন্য একটী (Protection Duty) সংস্থাপিত হয়। ভারত হইতে ম্যান্‌চেষ্টারে যত তুলা যায়, তাহার উপর কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে শুল্ক ধার্য্য করিলে বিলাতী কাপড়ের দর চড়িয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই দেশীয় কাপড় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক কাটিতে পারে, সুতরাং ভারতের তন্তুবায়কুল একবারে নির্ম্মূল হয় না, এবং রাজস্বেরও বিশেষ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ সঙ্গত উপায়ে রাজস্ব-বৃদ্ধি হইলে প্রজাদিগের প্রতি অযথা করস্থাপনের প্রয়োজন হয় না। কোন দুর্ব্বল জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বাধীন বাণিজ্যের গতি-রোধ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর যে করস্থাপন করা হয়, তাহারই নাম রক্ষাকর। যেমন কোন পালওয়ানের সহিত মল্লযুদ্ধে দুর্ব্বলের প্রাণসংশয়, সেইরূপ অতি উন্নতিশীল জাতির সহিত স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের মত দুর্ব্বল জাতির প্রাণধ্বংসের সম্ভাবনা। এই জন্য রক্ষাকর আমাদিগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে স্যালিস্‌বরী যখন রক্ষাকর উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন সেই সহৃদয় গবর্ণর জেনেরল্‌ ভারতের ভাবী দুঃখ অনিবার্য্য ভাবিয়া নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্ররোচনায় অসময়ে নিজের কার্য্য হইতে অবসৃত হন। যে ব্যক্তি সেই দুরূহ কার্য্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম, তাঁহারই

হস্তে ভারতের ত্রিশ কোটী অধিবাসীর অদৃষ্ট সমর্পিত হইল। সকলেই জানেন, এই নৃশংস কার্য্য লর্ড লীটন আসিয়া এক দিনে সম্পন্ন করিলেন।

এই বজ্রাকর ভারতে পুনঃ-প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য ভারতসভা পার্লেমেণ্টে আবেদন করেন। ইহারও ফল অব্যবহিত কিছু না হউক, ব্যবহিত কিছু আছেই সন্দেহ নাই।

সমাপ্ত।

মিলসম্বন্ধে সম্পাদকগণের অভিমতি।

"আমাদের মানসিক বৃত্তিসকলের সম্যক্ অনুশীলন ও সংস্করণই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। মিলের জীবনের এই উদ্দেশ্য ছিল— সুতরাং মিলের জীবন-চরিত মানুষের অদ্বিতীয় শিক্ষার স্থল। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিলের জীবনবৃত্তের বিস্তারিত বিশেষণ দ্বারা এই উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত এবং তল্লাভের পথ নির্ব্বাচিত করি। কি পুণ্যাচরণ করিলে এই নবাবিষ্কৃত চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয়, ইচ্ছা ছিল সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিস্তারিত করি।

"মনোবৃত্তিগুলি দ্বিবিধ—জ্ঞানার্জ্জনী এবং কার্য্যকারিণী। উভয়েরই সম্যক্ অনুশীলনে ও স্ফূর্ত্তি-প্রাপণে মনুষ্যত্ব। মনুষ্যলোকে এমত অনেক দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্রের সমুদ্ভব হইয়াছে যে, সে সকল এই সুমহত্তত্ত্বের কাছে গিয়া দিশাহারা হইয়াছে। কেহ কেহ অর্দ্ধেক পাইয়াছে —অর্দ্ধেক পায় নাই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক, জ্ঞানেই মোক্ষ স্থির করিয়া কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির দমনই উপদিষ্ট করিয়াছেন—এজন্য প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্র মনুষ্যত্বসাধক হয় নাই। আবার পক্ষান্তরে, খ্রীষ্টধর্ম্ম কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিকে মনুষ্যত্বের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মও মনুষ্যত্বসাধক হইতে পারে না। আমরা সর্ব্বপ্রথমে মিলের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের কথা বলিব। সেই অনুশীলনের দুইটি উদ্দেশ্য ও ফল—প্রথম, জ্ঞানের অর্জ্জন, দ্বিতীয় বৃত্তিগুলির পরিপোষণ ও শক্তি-বৃদ্ধি। * * * *

মিলের অকালপাণ্ডিত্যের ইতিহাস আজি কালি সকলেই জানেন, সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না। আমাদিগের অনুরোধ— যাঁহারা সে বৃত্তান্ত অবগত নহেন, তাঁহারা তদ্বৃত্তান্ত মিলের

জীবনবৃত্ত হইতে অধীত করেন। দেখিবেন, তাহা অমূল্য শিক্ষা-পূর্ণ। * * * *

"তাহার পর মিলের আত্মশিক্ষা। গুরুদত্ত শিক্ষা বীজমাত্র—আত্ম-শিক্ষাই সকল মনুষ্যের শিক্ষার প্রধান ভাগ—কাণ্ড ও শাখাপল্লব। মিলের সেই আত্মশিক্ষার বিষয় মূলগ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া অবগত হইতে হইবে। আত্মশিক্ষার অন্তর্গত সংসর্গের ফল। আমরা যাহা-দিগের সর্ব্বদা সহবাস করি, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত, উপদেশ, তাহাদিগের কথা ও মানসিক গতি, ইহার দ্বারা আমরা সর্ব্বদা আকৃষ্ট, শিক্ষিত ও পরিবর্ত্তিত হই। মিলের জীবনীতে তাঁহার বন্ধুবর্গের সংসর্গের ফল অতি সুস্পষ্ট—জেম্‌স মিলকে ছাড়িয়া দিয়া, বেন্থাম, অষ্টিনদ্বয়, রোবক্, কার্লাইল প্রভৃতির প্রদত্ত যে শিক্ষা, তাহার অধ্যয়ন পরম শিক্ষার স্থল। সর্ব্বোপরি যিনি প্রথমে মিলের সখা, শেষে পত্নী, সেই অদ্বিতীয়া রমণী-প্রদত্ত শিক্ষা অতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে; এবং অতিশয় মনোহর। আমার ইচ্ছা করে, এই টুকুই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া বাঙ্গা-লীর গৃহিণীগণের হস্তে সমর্পিত হয়—তাঁহারা দেখুন, কেবল সীতা এবং সাবিত্রী স্ত্রীজাতির আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদধিক উচ্চতর আদর্শ আছে। যে রমণী পতিপরায়ণা, সে ভাল—কিন্তু যে পতির মানসিক উন্নতির কারণ, সে আরও ভাল।

"জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কার্য্যকারিণী-বৃত্তিগুলির অনুশীলনের কথা-সম্বন্ধে মিলের জীবনবৃত্ত অধিকতর সুশিক্ষার আধার। * * * আমরা এই খানে মিলের কথা সমাপন করিব। ভিতরে প্রবেশ করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন। সেই গ্রন্থের গুণ-দোষ-সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ বলিব—উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহার পর আধিক্য নিষ্প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ যে মনুষ্যজাতির দুর্ল্লভ শিক্ষার স্থল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ প্রশংসা করা যাইতে পারে, এমত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। তার পর, তাহার সঙ্কলন, গ্রন্থন ও বিচারপ্রণালীও প্রশংসনীয়। প্রধানতঃ তিনি মিলের স্বপ্রণীত

জীবনচরিত অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অনুবাদ নহে। মিলের জীবনবৃত্তে যে সকল দুরালোচ্য বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত হয়, যোগেন্দ্র বাবু সে সকল স্বয়ং বুঝিয়াছেন, এবং পাঠককে বুঝাইয়াছেন। অবতরণিকাটি আদ্যন্ত মৌলিক ও সুপাঠ্য। গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ। আমরা এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ প্রশংসনীয় বিবেচনা করি, এবং ইহা হইতে যুবকগণ শিক্ষালাভ করুক, এই উদ্দেশ্যে ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য অনুরোধ করি।"

[বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ও পৌষ, ১২৮৪। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)]

"গ্রন্থ খানি মিলের "আত্ম-জীবনবৃত্ত" হইতে সংগৃহীত বা অনুবাদিত বলিলেও হয়, কিন্তু অনুবাদ বলিয়া ইহা মৌলিকতা-শূন্য নহে। ইহার অনেক স্থলে গ্রন্থকারের বহু দর্শন, বহু অধ্যয়ন ও বহু বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষাও সুন্দর হইয়াছে। * *

"বঙ্গভাষায় একরূপ জীবনবৃত্তপ্রকাশের এই একপ্রকার প্রথম উদ্যম এবং এই উদ্যম যে সফল হইয়াছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা আধুনিক রাশীকৃত কাব্য, নাটক ও উপন্যাসের বিনিময়ে একরূপ এক খানি পুস্তক দেখিতে অন্তরের সহিত অভিলাষ করিয়া থাকি। বাস্তবিক এইরূপ পুস্তকই বঙ্গভাষার সাহায্য ও অলঙ্কার, এবং সংখ্যায় যত বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের মঙ্গল। আমরা আশা করি যে, সাধারণের মধ্যে ইহার পাঠক-সংখ্যা অল্প হইলেও, শিক্ষিতমণ্ডলী ইহার সমাদর করিতে ত্রুটি করিবেন না।"

[ভারত-সংস্কারক; ১২৮৪ সাল।]

OPINIONS OF THE PRESS.

HINDOO PATRIOT,—*January* 27, 1879.

We acknowledge with thanks the receipt of John Stuart Mill's Life in Bengali by Babu Jogendra Nath Bandyopadhyaya, M. A. It not only gives a sketch of the Life and career of the great philosopher but also of his views and theories on political economy, psychology, Sociology and the science of government. It is written in a classic style, and breathes a spirit of thoughtfulness not ordinarily met with among Bengali authors. We have much pleasure in commending it to our reading public.

BENGALEE—*April 17th*, 1880.

BABU Jogendra Nath Bandyopadhyaya, Vidyabhushan, M.A., has done a service to his countrymen by publishing a Biographical Account of Joseph Mazzini, the great apostle of Italian unity. The book is written in Bengali, and will commend itself to those who desire to see their native literature enriched. If there was any man whose character can stand forth as the model for imitation, it is that of Joseph Mazzini, who lived and died for his fatherland and fought its battles, undaunted by the terrors of the prison, the poniard of the assassin, and the sword of the executioner. The life of such a man, in whatever language it is told, will always be read with the deepest interest. * * * * * * *
One cannot contemplate that change without feeling the utmost reverence for the life and character of Joseph Mazzini. Nothing is, therefore, to be so much desired as that a people striving to better their political condition should study the life of Joseph Mazzini, a life at once so instructive and interesting. Looking at the book before us from this point of view, we cannot speak too highly of its importance and usefulness. Regarding its literary merits, we do not presume to say more than

that it is written in a pure, chaste and eloquent style, quite worthy of its subject, and that it deserves a very high place among the Vernacular works of the country. We hope the work will be introduced as a text book in our schools.

THE INDIAN MIRROR, *Friday, April*, 20, 1880.

THE LIFE OF JOSEPH MAZZINI, Part I,

(By JOGENDRA NATH BANERJEE VIDYABHUSAN, M. A.)

The Life of Joseph Mazzini of Genoa, who, prompted by an enthusiastic love of liberty, gave up his legal profession, for a political and patriotic life, presents several important features which can be sudied with great advantage by the Bengalis of present generation Babu Jogendra Nath Vidyabhusan deserves credit for writing in the Bengali language a detailed account of the life and doings of that Italian celebrity, and placing it before the educated Bengalis. * * * The best way to instil idea of patriotism into minds of the Bengalis is by bringing them into close contact with the biographies of celebrated patriots, and not by pestering the country with the perpetual, meaningless cries of *Bharat Joy* which have become the watchword of a certain portion of the Native community * * * Patriotism and love of unity—moral qualities that depend on one another for their growth and development—are, we believe, the chief points which the author is anxious to impress upon the minds of his readers. The language in which the work is written, is Bengali "pure and undefiled," and does credit not only to the taste and education of the author, but to his strong sense of attachment to his mother-language, which he has spared no pains to render acceptable by the clearness and elegance of his diction and by the nobleness of his sentiments.

NATIONAL PAPER,—*March* 30, 1880.

Of the many things that India has to learn from the Europeans, patriotism is the most prominent. A thorough surrender of the Self to the good of the country is a virtue now

almost unknown in India. If India is ever to rise from the depth of the present degradation, it must do so through the instrumentality of this virtue. Every one of us from our very infancy should be taught to subordinate the self to the general good. The best means of imparting this education is by means of making them read the biographies of patriots. * * The Life of Mazzini by Jogendra Nath Vidyabhusana, M. A., is the best work of the nature in Bengali. The subject which it treats of is the history of the Italian Revolution It is a narration of the means and appliances by which Italy was delivered of the Austrian yoke. It gives also a political life of the great Italian leader, to whose untiring exertions, the success of the struggle is principally due. Europe has not given birth to a greater patriot than Mazzini. * * * * That such a book ought to be selected for the private study of the Indian youths, we have no hesitation to say.

The language of the book is eloquent and the style is classic. The writer has had to coin many new words from the Sanskrit roots to express modern political ideas that were never expressed in Bengali before.